হাইলাকান্দি

বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন

২০২৫ ইং

হাইলাকান্দি রামকৃষ্ণ
সেবা সমিতির দুর্গাপূজা

ছাব্বিশে মুখোমুখি হিমন্ত-গৌরব

মিজো পাহাড়ে দূরপাল্লার ট্রেন

উনিশ গ্রাম হস্তান্তর - নীরব বরাক

বরাক বিজেপির পরম্পরা

সাহসী কবি আশুতোষ

নয়া অভিভাষণ নীতি ও উগ্র জাতীয়তাবাদ

হাইলাকান্দিতে কংগ্রেস - বিজেপির পুনরুত্থান

আলগাপুর-কাটলিছড়ায় কেন্দ্রবিন্দুতে সুজাম উদ্দিন

উৎসবের দিনগুলিতে সকলের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচে যাক, মনে রঙ লাগুক,
কাশফুলের মতন দুলে উঠুক সকলের মন....

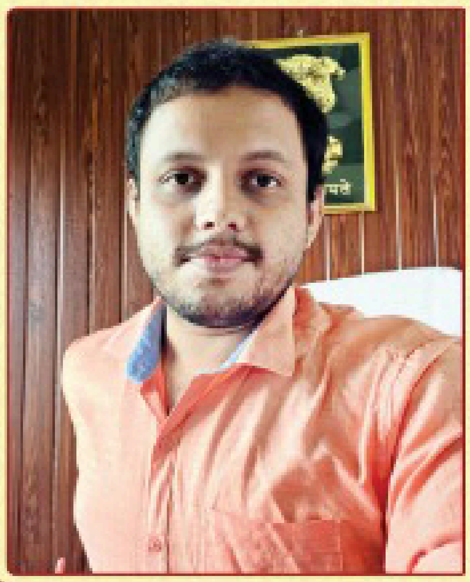

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন -

আদিত্য মুখার্জি

বিডিও

লালা ডেভেলপমেন্ট ব্লক, লালা

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
কামনা করি পুজোর দিনগুলো নির্বিঘ্ন ও আনন্দমুখর হয়ে উঠুক -

রাহুল গগৈ

বিডিও

কাটলিছড়া ডেভেলপমেন্ট ব্লক

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাহারুল ইসলাম মজুমদার

সভানেত্রী প্রতিনিধি

ধনিপুর ভবানীপুর জিপি

আনন্দমুখর শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে
সকলের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি-

দিলোয়ার হোসেন বড়ভুঁইয়া

জেলা পরিষদ সদস্য

রামচন্ডী নিমাইচান্দপুর জেলা পরিষদ

Bureau of Indian Standards
RADHA GOPINATH JEWELLERS
N. N. DUTTA ROAD, SILCHAR, ASSAM
Ph. : (03842) 246628, Mob. 9706822858
DURGA PUJA & DHANTERAS 2025
BIGGEST DISCOUNT OF THE YEAR
*Discounted Making Charge on GOLD ORNAMENTS
UPTO *20% DISCOUNT ON DIAMOND JEWELLERY
RGJ RADHA GOPINATH JEWELLERS
GOLD • SILVER • DIAMOND • PLATINUM
*Exclusive Discount ON 92.5 Sterling SILVER Ornaments
*Lucky Draw Coupon & Surprise Gifts
*T&C apply

Bureau of Indian Standards
রাধা গোপীনাথ জুয়েলার্স
এন.এন.দত্ত রোড, শিলচর, আসাম
ফোন ঃ (০৩৮৪২) ২৪৬৬২৮, মোবাইল ঃ ৯৭০৬৮২২৮৫৮
দুর্গাপূজা এবং ধনতেরাস ২০২৬
বছরের সবচেয়ে সেরা ছাড়
সোনার গহনার মজুরিতে *বিশেষ ছাড়
ডায়মন্ড জুয়েলারিতে *২০% পর্যন্ত ছাড়
RGJ রাধা গোপীনাথ জুয়েলার্স RADHA GOPINATH JEWELLERS
GOLD • SILVER • DIAMOND • PLATINUM
*92.5 স্টার্লিং সিলভার অলঙ্কারে আকর্ষণীয় ছাড়
*লাকি ড্র কুপন এবং আকর্ষণীয় উপহার
*শর্তাবলী প্রযোজ্য

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায় আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

লালা বিদ্যুৎ সংমন্ডল

লালা সাবডিভিশ্যনাল ইঞ্জিনিয়ার অফিস, লালা

আসাম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

শারদীয় দুর্গোৎসবের মরশুমে আপনার বাড়ি আলোকিত রাখুন। গ্রীষ্মকালে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখতে APDCL-কে সহায়তা করার জন্য আপনার বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন।
একটি উন্নত বিদ্যুৎ সরবরাহের অংশীদার হোন

আপনার বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সময়মতো পরিশোধ করুন এবং পরিষেবা বিভ্রাট থেকে রক্ষা পান

PM SURYA GHAR MUFT BIJLI YOJANA

এই প্রকল্পের অধীনে ভারত সরকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিনামূল্যে সৌরশক্তি সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মাধ্যমে আপনি সহজেই Solar Plant স্থাপন করে ঘরে বসেই বিদ্যুৎ সুবিধা পেতে পারবেন, যা দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় করবে।

1. **বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ** এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার গ্রাহকদের বিনামূল্যে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের সুযোগ করে দিচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় করবে।
2. **পরিবেশ বান্ধব ঃ** সৌর বিদ্যুৎ পরিবেশবান্ধব এবং দূষণমুক্ত, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে সহায়ক।
3. **বিদ্যুৎ সরবরাহে নিরবিচ্ছিন্নতা ঃ** সৌর প্লেট ব্যবহারের ফলে গ্রাহকরা বৈদ্যুতিক ঘাটতির সময়ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে পারেন।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন -
লালা সাবডিভিশ্যনাল ইঞ্জিনিয়ার অফিস, লালা

সত্যব্রত রুদ্রপাল

সাবডিভিশ্যনাল ইঞ্জিনিয়ার
আসাম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
লালা বিদ্যুৎ সংমন্ডল

বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন

হাইলাকান্দি

RNI Regd No- Rn- 64351/96

বর্ষ - ৩০, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২৫

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
নুরুল মজুমদার

মুখ্য সম্পাদক
অমিত রঞ্জন দাস

সম্পাদক ও প্রকাশক
জেরিন আক্তার মজুমদার

অলঙ্করণ
কবীর মজুমদার

সহযোগিতায়
নজমুল ইসলাম তাপাদার

বর্ণ বিন্যাস
নূর আহমেদ চৌধুরী

মুদ্রণে:
মেসার্স নিউ জামাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
হাইলাকান্দি - ৯৪৩৫২২০০০৯

যোগাযোগ
সম্পাদক, হাইলাকান্দি
(বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন)
কলেজ রোড, লালা, ওয়ার্ড নং:-১০
পো:-লালা-৭৮৮১৬৩, হাইলাকান্দি
অসম।
email-nmazumderhkd@gmail.com
Cell-8638898750/9435179030
E-Magazine : hailakandimagazine.com

মূল্য ঃ ₹ ৫০ টাকা মাত্র।

উৎসবের আনন্দে সাহিত্যের ছন্দে

শারদ সংখ্যা ২০২৫

সূচিপত্র

১। **সম্পাদকীয়** — আলোকের যাত্রা — ৪

২। **দেবী প্রসঙ্গ** — হাইলাকান্দি রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির দুর্গাপূজার আদি কথা - *সুশান্ত মোহন চট্টোপাধ্যায়* — ৫

৩। **আলোকপাত** — মিজো পাহাড়ে দূরপাল্লার ট্রেন - উন্নয়নের মাইলফলক - *আশিসরঞ্জন নাথ* — ৭

৪। **সাময়িকী** — উনিশ গ্রাম হস্তান্তর - নীরব বরাক - *সঞ্জীব দেবলস্কর* — ৯
সাহিত্য যখন ফেসবুক নির্ভর - *শান্তশ্রী সোম* — ১১

৫। **প্রচ্ছদ নিবন্ধ** — ছাব্বিশে মুখোমুখি হিমন্ত-গৌরব - *মনজুর আহমেদ বড়ভুঁইয়া* — ১৪

৬। **ভোট চর্চা** — হাইলাকান্দিতে কংগ্রেস - বিজেপির পুনরুত্থান - *নইমুল ইসলাম চৌধুরী* — ১৬
আলগাপুর-কাটলিছড়ায় চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে বিধায়ক সুজাম উদ্দিন -*জুয়েল আহমেদ তাপাদার* — ১৮

৭। **রাজ্য রাজনীতি** — শাসনের কর্তৃত্ব ও বরাক বিজেপির পরম্পরা - *শংকর দে* — ২০

৮। **ফিচার** — নয়া অভিবাসন নীতি অসমে ফের উসকে দিল উগ্র জাতীয়তাবাদ - *বিভূতি ভূষণ গোস্বামী* — ২৩

৯। **সত্য ঘটনা** — নিশা রাতের কান্না - *অমিত রঞ্জন দাস* — ২৫

১০। **সাহিত্য**
এক বিষন্ন সন্ধ্যার গল্প - *রীতা চক্রবর্তী (লিপি)* — ২৭
নীল বিচ্ছেদ - *অলকা গোস্বামী* — ২৯
রীনা ভাবী এবং - *কবীর মজুমদার* — ৩০
অদ্ভুত ঐশানী বৌমা - *নন্দিতা নাথ* — ৩৭
জীবন প্রবাহে - *সুস্মিতা মজুমদার* — ৩৯

১১। **কবিতা** — জুবিন গর্গ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি, চলমান মুখোশ, প্রেয়সী কন্যা, একটি ভুল ছড়া, আকাশে ছবি আঁকা, সাইরং রেলপথ, সমীকরণ, এইসব ভয়ানক অন্ধকারে, জুবিন দা, হ্যালো আমি জুবিন বলছি, সন্ধ্যাতপ, অন্তরালে, অমৃত সন্ধান, গরবিনী বাঙালি — ৪১-৪৩

১২। **ব্যক্তি বিশেষ** — সাহসী কবি আশুতোষ দাস - *এন, মজুমদার* — ৪৪

১৩। **অনুসন্ধান** — বরাকের বাংলা সাহিত্যের লিগ্যাসি - *উত্তমকুমার সাহা* — ৪৬

সম্পাদকীয়

আলোকের যাত্রা...

রেল মানচিত্রে দেশের রাজধানীর সঙ্গে মিজোরামের যুক্ত হওয়া উত্তরপূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সরকারের এই উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ মিজোরাম সহ সমগ্র উত্তরপূর্বের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই এক মাইলফলক। উত্তরপূর্বের মিজোরামে রেল লাইনের প্রসারণ নিঃসন্দেহে উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার চেয়েও বড় কথা এই রেললাইন ধরে সমগ্র দেশের সঙ্গে মিজোরাম সহ উত্তরপূর্বের বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। বাড়বে ব্যবসায়ীক লেনদেন। সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চল ব্যাপী ব্যবসার নতুন দিক উন্মুচিত হবে। দেশের রাজধানীর সঙ্গে মিজোরামের রেল সংযোগ স্থাপন এই অঞ্চলের সমাজজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। একেবারে সহজভাবে বললে মিজোরামের সাইরং পর্যন্ত রেললাইনের প্রসারকে এক সময়ের সন্ত্রাসদীর্ণ মিজোরামের জন্য আশীর্বাদ বলা যেতে পারে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের ভাষায় রেললাইনের এই সম্প্রসারণ মিজোরামের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যোদয় ঘটাবে। দীর্ঘ তিরিশ বছর এই মিজোরাম সন্ত্রাসের ঘাঁটি ছিল। ১৯৮৬ সালে মিজো শান্তি চুক্তির হাত ধরে মিজোরাম জাতীয় জীবনের মূল ধারায় এসেছিল। স্বাধীনতার পর মিজোরাম ছিল অসমের এক জেলা। জেলা থাকাকালে মিজোরামের বাসিন্দাদের মধ্যে সরকার বিরোধী চাপা ক্ষোভ বিরাজমান ছিল। ১৯৫৯ সালে গোটা মিজোরাম জুড়ে বাঁশফুল ফুঁটেছিল। এতে মিজোরামে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ উঠে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে মিজোদের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। ক্ষুব্ধ মিজোরা উগ্রবাদী সংগঠন গড়ে সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলে। ১৯৬৬ সালে উগ্রবাদী সংগঠন মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এম.এন.এফ) স্বাধীন মিজো রাজ্যের দাবিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষনা করে। এভাবে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে চলা আন্দোলনের অবসান ঘটিয়ে মিজো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৬ সালে এন এম এফ প্রধান লাল ডেংগা এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মধ্যে মিজো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শর্ত মতে মিজোরামকে পুর্নাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা প্রদান করা হয়। এভাবেই মিজো চুক্তির হাত ধরে এই পাহাড়ি রাজ্যে শান্তির যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। ২০২৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পতাকা দেখানোর মাধ্যমে মিজোরামের সাইরং থেকে দেশের রাজধানীতে রেল সংযোগ স্থাপিত হওয়ার মাধ্যমে সেই শান্তি যাত্রা উত্তরপূর্বের জন্য প্রগতির জয়যাত্রায় উন্নীত হল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মিজো চুক্তির মাধ্যমে উত্তরপূর্বে আরম্ভ হওয়া শান্তি যাত্রা এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে প্রগতির যাত্রায় রূপান্তরিত হল। বাস্তবিক অর্থে এই রেলযাত্রা উত্তরপূর্বের জন্য অবশ্যই আলোকের যাত্রা।

দেবী প্রসঙ্গ

হাইলাকান্দি রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির দুর্গাপূজার আদি কথা

সুশান্ত মোহন চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান সময়ে শারদীয়া দুর্গাপূজা ভারতের জাতীয় উৎসবে পর্যবসিত হয়েছে। সনাতন বাঙালির কাছে এই উৎসব রাজসূয় যজ্ঞের মতো। ধনী, দরিদ্র, কৃষক, কামার, কুমার, মালী সবাই এই পূজার অংশীদার। তাই শারদীয়া দুর্গাপূজায় আনন্দ থাকে বাঁধভাঙা।

ব্রিটিশ ভারতে এই পূজা বারোয়ারী অঙ্গনে প্রবেশ করলেও মূলত বিত্তশালী পরিবারেই পূজার প্রচলন ছিল বেশী। সেক্ষেত্রে আমাদের হাইলাকান্দি শহর বা শরতলিতে উল্লেখযোগ্য পারিবারিক পূজা ছিল রাঙাউটির শর্মা পুরকায়স্থ বাড়ি, লক্ষ্মীসহর পীরের চক এলাকার রায়বাহাদুর রায়সাহেব বাড়ি এবং শিববাড়ি রোডের প্রদোষ দত্তগুপ্তের বাড়ি। প্রাচীন বারোয়ারী বা প্রাতিষ্ঠানিক পূজার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো মঙ্গল ধামের বারোয়ারী পূজা, যুব সমিতি, তরুণ সংঘ, লক্ষ্মীসহর কালীবাড়ি, উত্তর পল্লী পূজা কমিটি, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, ভৈরব বাড়ি ইত্যাদি। তাছাড়া পাঁচ দশকের উর্ধকাল থেকে চলে আসা অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানই রয়েছে। তবে আজ এখানে হাইলাকান্দির শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির শারদীয়া দুর্গাপূজার ইতিহাস নিয়েই কথা বলব।

মাত্র ছয় বছর। তারপরই হাইলাকান্দির এই শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি নামক প্রতিষ্ঠানটি শতবর্ষের উৎসব পালন করবে। সনটা ছিল ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ। হইলাকান্দি শহরে তখন ধীরে ধীরে লোকসংখ্যা বাড়ছে। কেউ ব্যবসার জন্য, কেউ সরকারী কাজে শহরে বাড়ি ঘর নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেছেন। আশপাশ এলাকায় গরীব দুঃস্থ গ্রামীন জনগণই বেশী। তাই তাদের সেবার জন্য অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ পরহংসদেব, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে **মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমাজসেবী মিলে হাইলাকান্দি শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি নামের প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবি হরসুন্দর চক্রবর্তী** এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হলেন সরোজ ব্যানার্জী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন হরিপ্রসন্ন আচার্য, ডাঃ অমূল্য রতন সেনগুপ্ত, রায়সাহেব বাড়ির বংশধর প্রমুখ ব্যক্তিরা। এরপর দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদির ফলে এই সমিতির কাজের বিস্তৃতি বেড়ে যায়। সময়ে সময়ে কলকাতা থেকে মহারাজজীরাও আসতেন এই সেবামূলক কাজে উৎসাহ এবং পরামর্শ প্রদানের জন্য।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত বিভাজন ও স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্থান থেকে ছিন্নমূল, স্বজন সুজন হারা লোক এখানে এসে আশ্রয় নেন। তাদের সঠিক দিশা নির্দেশ ও পুনর্বাসনে এই সেবা সমিতি এক উল্লেযোগ্য অবদান রাখে। ১৯৩১ থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও সেবা কাজের সাথে জড়িত থাকলেও দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান করেনি। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো এখানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জানা যায়, সে বছর চণ্ডীপুর চা-বাগানের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ললিত মোহন দেবরায়ের বাড়ির পুজোটি বিশেষ কারণে বাড়িতে করা যায়নি তাই তারা তাদের বাড়ির পূজাটি সেবা সমিতিতে স্থানান্তরিত করেন। সেই শুরু। এরপর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিরতিহীন ভাবে এই সেবা সমিতির পূজা চলে আসছে। সে বছর সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবি হরসুন্দর চক্রবর্তী এবং সম্পাদক সরোজ ব্যানার্জীর

নেতৃত্বে দুর্গাপূজায় মোট ব্যয়ের পরিমান ছিল ৪৯২টাকা ৮৪পয়সা মাত্র যা ভক্ত ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা হিসাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে এই সেবা সমিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। সঙ্গে সেবা মূলক কাজের পরিধিও বাড়ছে। সম্প্রতি অতিমারী করোনাকালে ও বিগত বন্যায় হাইলাকান্দির শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি প্রচুর কাজ করেছে। গত এক দশক থেকে প্রতি বৎসর স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। আসাম সরকারের বরিষ্ঠ মন্ত্রী গৌতম রায়ের প্রচেষ্টায় যে নতুন মন্দির স্থাপিত হয়েছে তা উত্তর পূর্বাঞ্চলে এক দর্শনীয় মন্দির হিসাবে পর্যটক ও দর্শকের নিকট আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নবনির্মিত এই মন্দিরটির শুভ উদ্বোধন হয়েছিল ২২শে জানুয়ারী, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে। জনজাতি ছাত্রদের শিক্ষার জন্য এই সেবা সমিতিতে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। সম্প্রতি আসাম সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই সেবা সমিতিতে ছাত্রাবাসের দ্বিতল নির্মাণের জন্য আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করেছেন এবং নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সামাজিক বিভিন্ন কাজ তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দুর্গাপূজাও ধার্মিক পরম্পরায় অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সভাপতি শেখর চৌধুরী, সম্পাদক দেবজিৎ চক্রবর্তী এবং কোষাধ্যক্ষ সুবিমল চক্রবর্তী সহ অন্যান পরিচালন সমিতির সদস্যগণ পূর্বজদের এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজাতে ব্যয় হয়েছিল ৭,৯২,৮৫০.০০টাকা। এবছর অর্থাৎ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১০,০০,০০০.০০টাকা।

তথ্যসূত্র -
রত্নদীপ ভট্টাচার্য, গণপতি অর্জুন, সুবিমল চক্রবর্তী।
(বর্তমান পরিচালন সমিতির সদস্য)

<><><><><>

Sanjukta

Address :
SANJUKTA AGRO PRODUCTS
Daspatty, Sribhumi, Assam - 788710
E-mail : jcbanik1956@gmail.com || Ph. No.: (0383) / 9394068606

বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন

আলোকপাত

মিজো পাহাড়ে দূরপাল্লার ট্রেন - উন্নয়নের মাইলফলক

আশিসরঞ্জন নাথ

এক সময়ের উপদ্রুত পাহাড়ি রাজ্যে আজ উন্নয়নের চাকা ঘুরছে। অনেক বছর হলো পাহাড়ে জঙ্গি আন্দোলন আর জঙ্গিদের বন্দুকের গুলির আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। স্বস্তি ও শান্তির পরিবেশ বিরাজ করছে উত্তর পূর্বের এই পাহাড়ি রাজ্যে যা অবশ্যই ইতিবাচক। যথেষ্ট আশাজনকও। আর এমন শান্তিপূর্ণ আবহের জন্য আজ দেশের রেলমানচিত্রে মিজোরামের মতো দুর্গম পাহাড়ি রাজ্যও অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইংরেজি সে রাজ্যের এক নতুন ঐতিহাসিক মুহূর্তের সৃষ্টি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিন তিনটি দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রারম্ভ করেন। অদূর ভবিষ্যতে শুধু দিল্লি নয়,বেঙ্গালুরু,চেন্নাই প্রভৃতি স্থানের সঙ্গেও মিজোরামের রেলসংযোগের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওই দিন ভৈরবী-সাইরং ৫১ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। আর মিজোরামকে রেলমানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করার সূত্রে অবহেলিত ও পশ্চাদপদ হাইলাকান্দি জেলার ভাগ্যেও জুটে গেলো দূরপাল্লার ট্রেনগুলি। স্বাধীনতার ৭৯ বছর পর মিজোরামের ভাগ্য পরিবর্তনের সুবাদে এ জেলার মানুষেরও ভাগ্য বদলাতে শুরু করলো। স্বাধীনতার আগে লালাঘাট-কাটাখাল যাত্রীট্রেন ছিল একমাত্র অবলম্বন। ব্রিটিশের সময়ে কাটাখাল নদীপথে বাহিত কাঁচামাল, কাঠ, বাঁশ, চাপাতা অন্যত্র পরিবহনের স্বার্থে একটি ব্রিটিশ কোম্পানি অধুনালুপ্ত কাটাখাল পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন করেছিল। 'মালগাড়ি' ছাড়াও যাত্রীট্রেন চলাচলের সুবিধাও ছিল। **স্টিম**

ইঞ্জিন চালিত যাত্রীট্রেনের সঙ্গে অনেক সময় মালগাড়িও জুড়ে দেওয়া হতো। স্বাধীনতার অনেক বছর পর ডিজেল ইঞ্জিন চালিত যাত্রীট্রেন চলাচল করতে শুরু করে। তখন অবশ্য যাত্রীট্রেনের সঙ্গে মালগাড়ি জুড়ে দেওয়া হতো না। ১৯৮৫ সাল নাগাদ মিজোরামের ভৈরবীকে রেলমানচিত্রে সংযোজন করার উদ্দেশ্যে রেলের ট্র্যাক পরিবর্তনের কাজ আরম্ভ হয়। আর তখনই লালাঘাট স্টেশন ইতিহাসের পাতায় বিলীন হয়ে পড়ে। আজ স্টেশনটি পরিত্যক্ত। বর্তমানে ব্রডগেজ রূপায়ন এবং বিদ্যুৎচালিত রেল চলাচলের বৈদ্যুতিয়ানের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পরও গুয়াহাটি পর্যন্ত সরাসরি যাত্রীট্রেনের দাবিতে মুখর ছিল হাইলাকান্দি জেলা। কিন্তু গণদাবি পূরণ হয়নি। আমাদের জনপ্রতিনিধিরা এ নিয়ে তেমন তদ্বিরও করেননি। তবে সাইরং থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস,সাইরং-কলকাতা এবং সাইরং-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনের কল্যাণে হাইলাকান্দি জেলাও এসব ট্রেনের সুবিধা পাবে।

স্বাধীনতার ৭৯ বছর পর এই প্রথম রেলপরিষেবার সুযোগ পেয়ে জেলার মানুষ উল্লসিত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রেলভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা থাকলেও নিজের জেলার উপর দিয়ে তিন তিনটি দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা পেয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছেন মানুষ। এত দিন যা ছিল কষ্টকল্পনা তা যে আজ হাতের নাগালে। তাই আনন্দ-উচ্ছ্বাস হওয়া স্বাভাবিক।

জেলার মানুষ ট্রেন তিনটির যাত্রারম্ভের আগের দিনকয়েক থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ফ্ল্যাগ অফের আগের দিন অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর ট্রেনগুলির সাইরং যাওয়ার দৃশ্য কৌতূহল নিয়ে প্রত্যক্ষ করেন। তাদের উৎসাহ দেখে অনেকের কাছে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালির অপু-দুর্গার প্রথম ট্রেন দর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়। কী অগাধ কৌতূহল আর আগ্রহে সেদিন অপু-দুর্গা ট্রেন দেখেছিল! ব্রিটিশের সময় রেল সম্প্রসারণ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের আরেক নাম ছিল। যার অর্থ ছিল ক্ষমতা ও আধিপত্যের বিস্তার। অপু দুর্গা সে সব জানতো না বা বুঝার মতো বয়সও ছিল না। তাদের চোখে মুখে লৌহশকটটি ছিল অপার বিস্ময়ের ব্যাপার। ফ্যাল ফ্যাল করে তারা দেখেছিল সেদিন জীবনের প্রথম রেলগাড়ি। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ মানে উন্নয়নের অন্য নাম। তবুও নতুন রেল সম্প্রসারণে অগাধ কৌতূহল এবং উৎসাহ দেখা দেয়। কারণ স্বাধীনতার ৭৯ বছর বাদে রেল ভ্রমণের স্বাদ উপভোগ করার দ্বার উন্মোচন হওয়া অনেক বড় প্রত্যাশার পূরণ। মিজোরামের মতো দুর্ভেদ্য পাহাড়ি রাজ্যে রেল ভ্রমণ ছিল দূর স্বপ্নের বিষয়। কষ্ট কল্পনার আরেক নাম। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিল কাশ্মীর যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই মিজোরামও।

দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল এখন যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। রেল সম্প্রসারণে তার

প্রমাণও মিলছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে ইস্ট ওয়েস্ট নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। শিলচর-সৌরাষ্ট্র সড়কপথ সংযোগ করতে জাতীয় মহাসড়ক তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছিল তাঁরই সময়ে। যদিও মহাসড়কের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সে কাজও সমাপ্ত হয়ে যাবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলকে গুরুত্ব প্রদানে অটলবিহারীকে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে নি:সন্দেহে। তাঁরই উত্তরসূরীর দায়িত্ব পালন করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মিজোরামকে রেলমানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যোগী হয়।

তারও অনেক আগে গেজ পরিবর্তন করে যখন ব্রডগেজে রূপান্তরিত করার কাজ শুরু হয় তখন থেকে কিছুটা আশার আলোর ঝিলিক দেখতে পান এই অঞ্চলের মানুষ। ১৯৮৫ সাল নাগাদ আসামের হাইলাকান্দি জেলার লালাবাজার স্টেশন থেকে কাটাখাল মিজোরামের ভৈরবী পর্যন্ত ট্র্যাক সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ হয়। বেশ কয়েক বছর নির্মাণ কাজে লেগে যায়। পাহাড়ি চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে,খানা খন্দকে টপকে রেল সম্প্রসারণের কাজ সহজ ছিল না। অবশেষে ২০১৬ সালের ২৮ মে ভৈরবী থেকে শিলচর পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের সূচনা হয়। সেই সূত্রে মিজোরামের সঙ্গে অসম তথা দেশের অন্য অংশের সঙ্গে প্রথম রেল সংযোগের সূচনা। এও এক যুগান্তকারী ব্যাপার ছিল।

নতুন রেলপথটি হবে মিজোরামের রাজধানী আইজলের ‘লাইফলাইন’। এতে যাত্রী চলাচল যেমন সহজ হবে, তেমনই রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিও আসবে। কলকাতা, দিল্লি ও আগরতলার সঙ্গে সরাসরি রেল সংযোগ চালু হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘ বছর ধরে এই প্রকল্পের সমীক্ষা এবং পুনঃসমীক্ষার পর অবশেষে তা জাতীয় প্রকল্প হিসেবে গৃহীত হয়। ২০১৪ সালে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নয় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ১১ বছরের নিরলস প্রচেষ্টার পর এখন তা সফল হয়েছে। প্রায় ৫১ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরবী-সাইরং রেলপথ নির্মাণের জটিলতা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে। কারণ পুরো পথটি দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। রেল দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, লাইনে রয়েছে ৪৮টি টানেল, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩ কিলোমিটার। তৈরি হয়েছে ৫৫টি বড় সেতু এবং ৮৭টি ছোট সেতু। টানেলগুলির সৌন্দর্যও উল্লেখ করার মতো। টানেলের প্রবেশ পথে তার গায়ে সে রাজ্যের উপজাতিদের সাংস্কৃতিক পরিচিহ্ন আঁকা হয়েছে। রেলকর্তৃপক্ষ সে রাজ্যের মানুষদের এতে অন্য মাত্রার মর্যাদা দান করেছে। চারটি আধুনিক স্টেশনও তৈরি হয়েছে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তিতে।

এই রেলপথে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ১৯৬ নং সেতু। সেতুটির উচ্চতা ১০৪ মিটার, যা দিল্লির ঐতিহাসিক কুতুবমিনার (৪২ মিটার) থেকেও উঁচু। আইজল রাজধানী শহর থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে সাইরং রেল স্টেশন পেরিয়ে সাইরং সেতু। রেল মানচিত্রে এই সেতুটি দেশের দ্বিতীয় রেল সেতু। দেশের সর্বোচ্চ সেতুটি কাশ্মীরে চেনাব নদীর উপর।২০২৩ সালের আগস্ট মাসে সাইরং সেতুটির কাজ চলার সময় অকস্মাৎ মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। হঠাৎ সেতুটি ভেঙে পড়ে। ফলে ২৬ জন কর্মরত শ্রমিক অকালে প্রাণ হারান। শ্রমিকদের অধিকাংশ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও বহরমপুর জেলার। এই মর্মন্তুদ ঘটনায় দেশ জুড়ে গভীর শোক নেমে এসেছিল। যাহোক,শোকের আবহ কাটিয়ে ফের শুরু হয় সেতুর নির্মাণ কাজ। যা দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সেতুর মর্যাদায় ভূষিত। এই একটিমাত্র দুর্ঘটনা ছাড়া এই লাইনে সম্প্রসারণ কাজের ১১ বছরে তেমন বড় দুর্ঘটনার খবর নেই।

এই প্রকল্প উত্তর পূর্ব ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক ‘গেম চেঞ্জার’ হিসেবে কাজ করবে। এই রেললাইন চালু হলে ত্রিপুরা (আগরতলা), অসম (দিসপুর), অরুণাচল প্রদেশ (ইটানগর) ও মিজোরাম (আইজল) সরাসরি যুক্ত হবে রেল নেটওয়ার্কে, যা বাকি চারটি রাজ্যকেও পর্যায়ক্রমে রেলপথের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

উত্তর পূর্ব ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নে এই প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। সাইরং পর্যন্ত রেলপথ এই বিস্তৃত অঞ্চলের শিক্ষা,সংস্কৃতি,বাণিজ্য প্রভৃতির পক্ষে আশীর্বাদ নিয়ে আসবে। বিশেষত বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।

<><><><><>

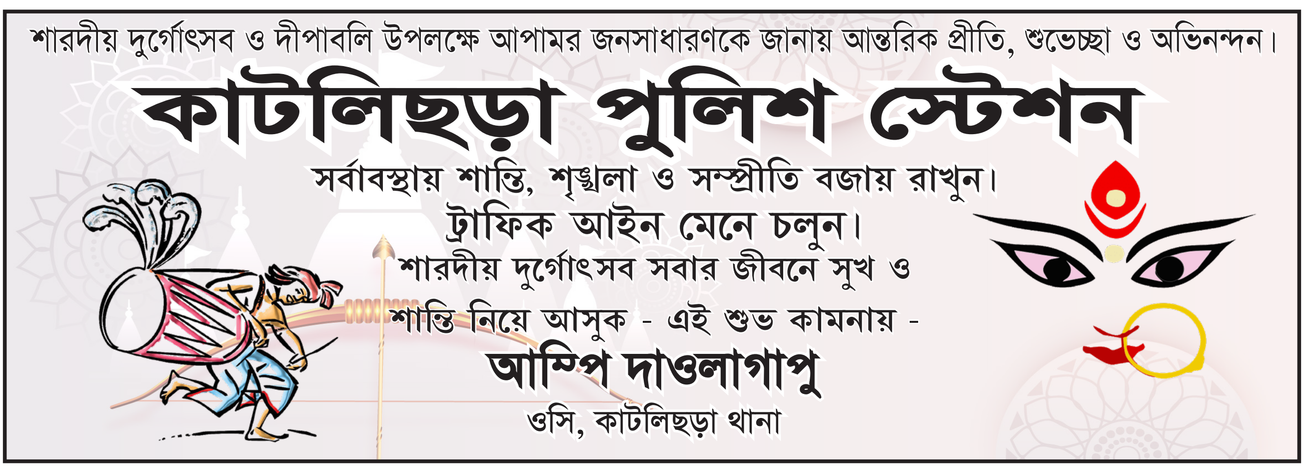

সাময়িকী

উনিশ গ্রাম হস্তান্তর – নীরব বরাক

সঞ্জীব দেবলস্কর

—ওরা দাবি করছেন কাছাড়ের লক্ষীপুর মহকুমার ১৯টি গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে ডিমাহাসাও জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হোক। এর উপর আরেকটি বায়না-- সঙ্গে চন্দ্রনাথপুর থেকে জিরিঘাট বাজার পর্যন্ত অঞ্চলের ৯৬টি গ্রামও পার্বত্য জেলার সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে। এ মর্মে প্রাক্তন জঙ্গিদের সঙ্গে সরকারের চুক্তির কথাও শোনানো হচ্ছে। এ কোন ভারতবর্ষের চেহারা! প্রস্তাবটি নিছক প্রশাসনিক পুনর্গঠনের প্রস্তাব নয়। এটি ঔপনিবেশিক আমলের divide and rule নীতির আধুনিক সংস্করণ।

ঐতিহাসিক কাল থেকে কাছাড়ে ডিমাসা ও বাঙালি সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ছিল সুসমন্বিত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। বঙ্গভাষীদের সাহচর্যে কাছাড়ে ডিমাসা অধ্যুষিত অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। মাইবং রাজসভা থেকে সমতলে ডিমাসা রাজত্ব সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়ায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। রাজসভার নথিপত্র, সনদ, প্রস্তরলিপি ও মুদ্রায় বাংলা ভাষার ব্যবহার, এমনকি স্বয়ং রাজাদের বাংলায় রচিত শাক্তগীতি, বৈষ্ণবীয় পদ, রাসোৎসব গীতামৃত প্রমাণ করে এই সহযোগিতা এবং সহাবস্থানের ভিত্তি অতি দৃঢ়।

কিন্তু আজ সেই অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিভেদের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি, এবং সঙ্গে মণিপুরি, রাজবংশী, খাসি, হিন্দিভাষীসহ অন্যান্যদের—প্রশাসনিকভাবে নিজ জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভিন্নতর ভূমি- আইনের অধীন পার্বত্য জেলার অন্তর্গত করার কথা সরকারের বিবেচনাধীন। এর অর্থ, বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে নিজ ভূমিতেই পরবাসী করে দেওয়া। এই সিদ্ধান্ত জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে একটি নিছক প্রশাসনিক নয়, গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তও বটে।

অঞ্চলটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মনে করলেই স্পষ্ট হবে এ অযৌক্তিক প্রস্তাবের অন্তসারশূন্যতা। ১৮শ শতকের পূর্ব থেকেই লক্ষীপুর অঞ্চলে বাঙালির বসতি, কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা ও অর্থনৈতিক জীবনকে সুসংহত রূপ দান করার অবদান ইতিহাস স্বীকৃত। ওই পর্ব থেকে বিশ শতকের দিকে এগিয়ে এলে দেখা যাবে এ ভূমির চেহারা পাল্টে গেছে। মানুষজনের মধ্যে জাতীয় চেতনার সঞ্চারও ঘটেছে।

১৯২১ সালে গঙ্গাদয়াল দীক্ষিতের নেতৃত্বে এ এলাকার মানুষ স্বদেশী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন।

ইতিপূর্বে ১৯১৪ সালে বড়খলার রায়বাহাদুর বিপিনচন্দ্র দেবলস্কর, যিনি লক্ষীপুরের মৌজাদার এবং আসাম বিধান পরিষদের সদস্যও ছিলেন-- তাঁরই উদ্যোগে আসামের গভর্নর এসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি ও অর্থদান করেন, যা আজ সেই আর্ল হাইস্কুল (বর্তমানে হায়ার সেকেন্ডারি) বহুভাষী অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিচ্ছে। বিপিনচন্দ্রের নামে লক্ষীপুরের একটি মধ্যবঙ্গ স্কুলও এর সাক্ষ বহন করছে।

১৯৬০-এর ভাষা আন্দোলনে ডিমাসাসহ নানা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে লক্ষীপুরের ঐক্যবদ্ধ রূপের প্রকাশ দেখেছি আমরা।

কিন্তু এখন এই ঐতিহ্যের পরিপন্থী একতরফা সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। এতে—

১. বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন

তৈরি হবে।

২. বহু শতাব্দী ধরে বসবাসকারী বাঙালিসহ অন্যান্য সম্প্রদায় তাদের জমি ও অধিকার হারানোর আশঙ্কায় পড়বে।

৩. সামাজিক সৌহার্দ্যের ভাঙন ঘটবে, যার ফল হবে অশান্তি।

খবরে প্রকাশ কারা যেন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন, যেখানে এই সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক, বৈষম্যমূলক ও ইতিহাসবিরোধী বলা হয়েছে। জনগণের দাবি, যা এখনও সুসংহত এক দাবির রূপ ধারণের অপেক্ষায় তা হল-:

১)অবিলম্বে লক্ষীপুরের ১৯ এবং সঙ্গে কাছাড়ের আরো ৯৬টি গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা।

২)বাঙালি জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া।

৩)নীতি প্রণয়নে স্থানীয় জনগণের মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

আজকের কাছাড়ে আপাতত আছেন একজন সচেতন শিক্ষাবিদ যিনি গাঁটের কড়ি খরচ করে লিখে গেছেন “ইতিহাসের আলোকে লক্ষীপুর মহকুমা”। বিনামূল্যে বই বিলি করেছেন হাতে হাতে, কিন্তু কেউ কি পৃষ্ঠা খুলে দেখেছেন? অন্তত বইতে সংযোজিত ১৯২১-২২এর অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ এর আইন অমান্য, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী, প্রায় চল্লিশটি নামের তালিকাটি দেখলেই ঘুমটি ভেঙে যাবার কথা। আরেকটি তালিকায় অঞ্চলটিতে পাঠশালা থেকে ডিগ্রি কলেজ পর্যন্ত যে ৬৬টি তিলে তিলে গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম আছে, এর পেছনে কাদের **স্বপ্ন, অর্থ, শ্রম ও ত্যাগ এটা বিবেচনায় না এনে আজ প্রধান হয়ে গেল কতিপয় বন্দুকধারী প্রাক্তন জঙ্গিদের প্রস্তাব।** যাদের প্রয়াসে লক্ষীপুর আজকের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এদের উত্তরপুরুষদের অধিকারের কথা কি কেউ বলবে না? শতাব্দীপ্রাচীন “খিলঞ্জিয়া” বাঙালি, মণিপুরি, ডিমাসা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে দেশভাগের বলি উদ্বাস্তুদের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা এই শান্ত, সমৃদ্ধ অঞ্চলটিকে আবার উদ্বাস্তু শিবির বানানোর কুটিল পরিকল্পনা কি কারো চোখে পড়বে না?

আমাদের ব্রাত্যজনের এ ভাষাচার্য যে-হরিনগরে বসে গভীর মমতা দিয়ে মাতৃভাষার অভিধান লিখেছেন—তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলে তাঁর কষ্ট কি আর কারো বুকে বাজবে না? এই প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত কার্যকরী হলে কেবল অঞ্চলটির মানচিত্রের পরিবর্তন নয়, এক ঐতিহাসিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

এ প্রস্তাব প্রত্যাহার না হলে কাছাড় তথা বরাকের জন্য এটি হবে ১৯৪৭-এর দেশভাগের মতোই আরেকটি বেদনাদায়ক অধ্যায়ের সূচনা।

<><><><><>

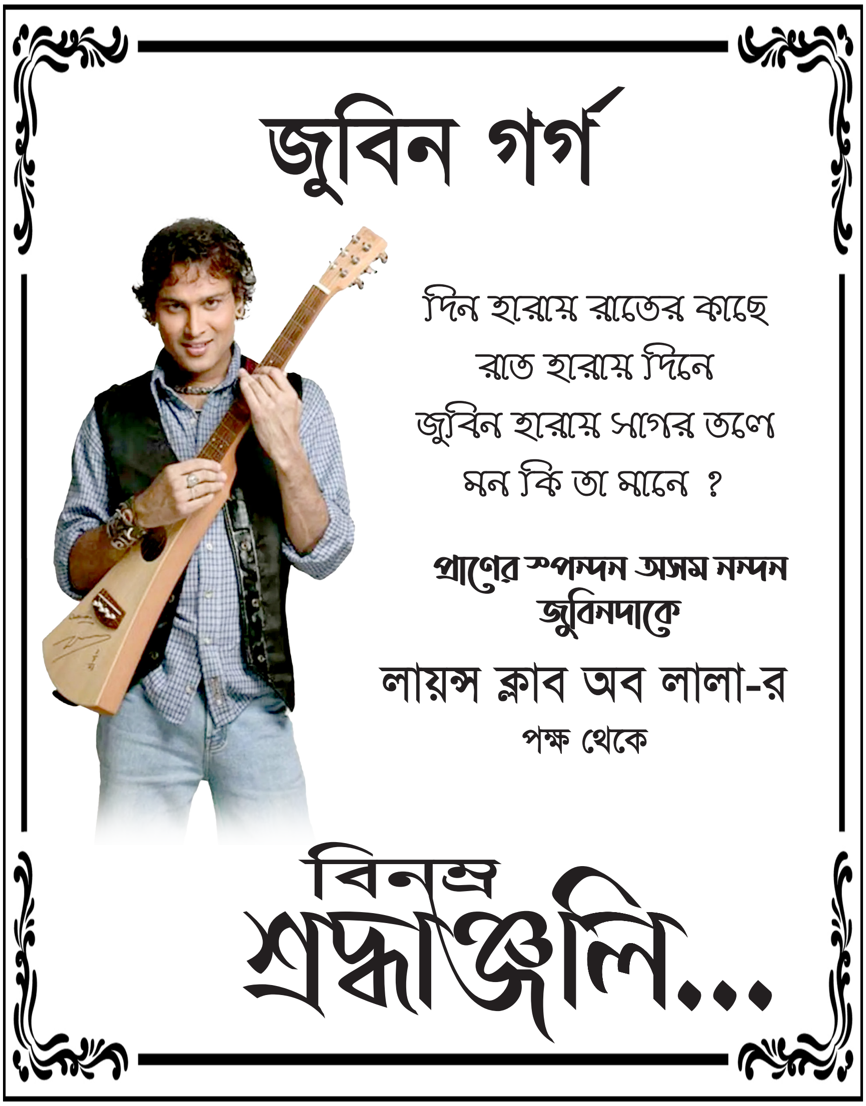

সাহিত্য যখন ফেসবুক নির্ভর

“রঙিন আকাশে মেঘের ভেলা ভাসাই
এসো প্রাণে প্রাণে অনুভূতি জাগাই”

শান্তশ্রী সোম

প্রচার মাধ্যমের জগতে হালের আমদানি হল সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম। এই মাধ্যমে জেটগতিতে পৌঁছে যাওয়া যায় নিজের পছন্দের টার্গেট রিডার বা অডিয়েন্সের কাছে। অর্থাৎ শ্রোতা, দর্শক, পাঠক, যাই খুঁজুন না কেন ; পেয়ে যাবেন ঝটপট। হাতের তালোয় মুঠোফোন। আর মুঠোবন্দী প্রচার মাধ্যম এবং কিপ্যাডে আঙুল চালানোর যা দেরি। ইউজার পৌঁছে গেছেন ব্রাউজারের কাছে।

কম্যুনিকেশন থিওরির ভাষায় - এই যে টার্গেট রিসিভার, এদের কাছে প্রিপেয়ার্ড মেসেজ বা ক্যাপসুলটা পৌঁছে দিতে সামাজিক মাধ্যম সবচাইতে সহজলভ্য দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যম। কাজেই ব্যাণ্ড ওয়াগন থিওরির বহুল প্রচলনের এই সময়ে দাঁড়িয়ে এহেন একখানা ইজি এ্যাক্সেস মাধ্যম যে জীবনের অংশ হয়ে যাবে, তাই তো স্বাভাবিক। একে এড়িয়ে জীবন যাপন করা এখন প্রায় অসম্ভব। পৃথিবীতে এখন প্রায় তিনশো কোটি লোক শুধু ফেসবুক ব্যবহার করেন। টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টেলিগ্রাম ইত্যাদির গুণতিতে আর নাই-বা গেলাম।—এসবেও আছেন আরও কোটি কোটি লোক।

এই যেখানে বাস্তব চিত্র, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বর্তমান সময়ের লেখকদের হয়তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে থাকতেই হয়। কিন্তু কতটা সময় তাঁরা ঐ মাধ্যমে থাকবেন তা অবশ্যই বিচার্য বিষয়। বহু সমাজ বিজ্ঞানী বিষয়টি নিয়ে সিরিয়াস চিন্তা ভাবনা করছেন।

মার্কিন লেখক ও ইউটিউবার ক্রিস্টোফার ককোসি বলেছেন, সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলো লেখকদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এসব থেকে লেখকরা যত দূরে থাকবেন, ততই তাঁদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। অহেতুক সময় নষ্ট করে এসব প্ল্যাটফর্ম। লেখকদের এসব পরিত্যাগ করা উচিত।

আবার আরেক লেখক হিটেন ভিয়াস বলেছেন ভিন্ন কথা। তাঁর মতে, লেখকদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে সামাজিক মাধ্যমগুলো। কারণ, এর মাধ্যমে লেখকেরা সহজেই নিজেকে পাঠকের সামনে পরিচিত করতে পারছেন। লেখকদের আরও বেশি সামাজিক মাধ্যমনির্ভর হওয়া উচিত। ফলে লেখকদের কি সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করা উচিত, নাকি উচিত নয়—এ নিয়ে সত্যিই এক ‘উভয়সংকট’ তৈরি হয়েছে।

কেন লেখকেরা ব্যবহার করবেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ! এই মাধ্যমের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, এর মাধ্যমে পাঠকের সামনে সরাসরি নিজেকে উপস্থাপন করানো যায়। এবং নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে পাঠকের মতামতের ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়েও একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এসব ছাড়াও অন্য যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে - অনেক অনেক নতুন পাঠকের কাছে নিজের সাহিত্য কর্ম পৌঁছে দেওয়া যায়।

একটা সময় ছিল, যখন নিজের লেখক পরিচয় তৈরি করার জন্য পত্রিকা বা সাময়িকীগুলোর দ্বারস্থ হতে হতো। তখন সেই সব **পত্রিকা বা সাময়িকীর সম্পাদকের হাতেই নবীন লেখকদের হয়ে ওঠা না ওঠা নির্ভর করতো।সামাজিক মাধ্যমগুলো সেই সমস্যার থেকে নবীন কলমচিদের মুক্তি দিয়েছে** । এখন লেখকেরা নিজেই নিজের লেখা ফেসবুকে পোস্ট করতে পারেন। এখানে কোনো সম্পাদকের হার্ডল আপনাকে পেরোতে হচ্ছে না। পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে হাজারো মানুষের কাছে তা পৌঁছে যায়। আর এভাবেই একসময় লেখকের একটা নিজস্ব পরিচয় তৈরি হয়ে যায়। আত্মপ্রকাশ হয় নতুন সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের।

সামাজিক মাধ্যমের আগে বই প্রকাশের জন্য প্রকাশক খুঁজতে হতো। এজেন্ট খুঁজতে হতো। বিশেষ করে শহরতলী, গ্রামগঞ্জে থাকা কোনো লেখকের শহরে এসে প্রকাশকের টেবিল পর্যন্ত নিজের লেখা পৌঁছানো ছিল বিশাল ঝক্কির ব্যাপার। এখন ফেসবুকের বিভিন্ন পেজে, বহু সাইটে তাদের নাগাল সহজেই পাওয়া যায়। এটা তো এক অর্থে লেখকদের জন্য আশীর্বাদই।

একইসঙ্গে একটি উপন্যাস, কবিতার বই, গল্প সংকলন প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশের পর পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যেও একসময় হাপিত্যেশ করতে হতো লেখকদের। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে গেলে, অথবা কোনো সাহিত্যের মিলনমেলায় শরিক হলে দেখা হয়ে যেতো সম-মনোভাবাপন্ন বহু লোকের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে আলাপ হলে , চেনাজানা হলে এসব লেখালেখি নিয়ে কথা হতো। লেখকদের এসব চেনা নাম, অথচ অচেনা ব্যক্তিত্ব’র বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মজার মজার ঘটনা রয়েছে। যা ইদানিং কালে এই সামাজিক মাধ্যমের নানান পেজে পাওয়া যায়। পছন্দের লেখকটি পাশেই

বসে আছেন। সহযাত্রীটি **‘ট্রেন জার্নি’র গোটা পথ শুধু নিজের পছন্দের লেখকের বিভিন্ন লেখাপত্তর নিয়ে ‘আহা ! উহু !’ করে গেলেন। পাশে বসে থাকা লেখকটি খুব মজা করে তা উপভোগ করলেন। ট্রেন থেকে নামার সময় বলে গেলেন, “আমি-ই আপনার সেই প্রিয় লেখক।”** তবে এখন লেখা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তা সরাসরি পাঠকের কাছে পৌঁছে যায় এবং পাঠকের প্রতিক্রিয়া প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়। লেখকের পোস্টের নিচে মন্তব্যের ঘরে পাঠক সরাসরি বলে দেন তাঁর ভালো বা মন্দ লাগার কথা।

নন-ফিকশন লেখকদের জন্য সামাজিক মাধ্যম খুব ভালো একটি প্ল্যাটফর্ম হতে পারে। কারণ, ফেসবুক ব্যবহারকারীরা তথ্যভিত্তিক লেখা বেশি পছন্দ করেন। এই বিষয়েও সমাজ বিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত মতামত রয়েছে। রটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক মর নাম্যান ও জেফরি বোয়াস গবেষণায় দেখিয়েছেন, ফেসবুকের সাধারণ পোস্টের চেয়ে তথ্যভিত্তিক পোস্টের ফলোয়ার তিন গুণ বেশি।

চ্যাডউইক মার্টিন বেইলি (সিএমবি) নামের একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান, যারা মূলত মার্কেট সার্ভে করে থাকে, তারা তাদের রিপোর্টে বলেছে যে- সামাজিক মাধ্যমে বিনোদনমূলক পোস্ট পড়েন ৭২ শতাংশ মানুষ, পরামর্শ ও সমাধানমূলক পোস্ট পড়েন ৫৮ শতাংশ মানুষ এবং রম্য পোস্ট পড়েন ৫৮ শতাংশ মানুষ।

সুতরাং বিনোদনধর্মী লেখক কিংবা রম্য লেখক, সবার জন্যই ফেসবুকে এক বিরাটসংখ্যক পাঠক অপেক্ষা করে আছেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও সামাজিক মাধ্যমে দারুণভাবে সহজ হয়ে উঠেছে। তা হলো নিজের প্রকাশিত বইয়ের প্রচার। ভালো পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে একটি বইকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার পরই তো আর প্রকাশকের দায় ফুরিয়ে যায় না! বরং এখান থেকেই তার আসল কাজটা শুরু হয়। বইটি যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাপক সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছোয়, প্রকাশকের মুনাফার কোনো আশা নেই। আর প্রকাশকের মুনাফা না হলে লেখকের রয়্যালটি পাওয়ার আশায়ও গুড়েবালি। এক্ষেত্রেও সামাজিক মাধ্যম একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়ে রয়েছে। বইয়ের প্রচার ও বিপণনের জন্যও সামাজিক মাধ্যম এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। লেখক নিজেই এসব প্ল্যাটফর্মে নিজের বইয়ের প্রচার চালাতে পারেন।

সবচেয়ে ‘লাইভলি’ যে বিষয়টি হচ্ছে, তা হলো মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ। যা সামাজিক মাধ্যম লেখকদের লেখার টেবিলে এনে বসিয়ে দিয়েছে পাঠকদের। লেখক-পাঠক মিথস্ক্রিয়া একজন লেখকের জন্য খুব জরুরি একটি বিষয়। আগে এই মিথস্ক্রিয়া একটু কঠিনই ছিল। বিভিন্ন জায়গায় সভা, সেমিনার, পাঠচক্রের আয়োজন করে পাঠকদের সঙ্গে কথা বলতে হতো। এখন লেখক নিজে যখন—তখন ফেসবুক থেকে লাইভে আসতে পারেন। সরাসরি কথা বলেন পাঠকের সঙ্গে।

এ তো গেল সামাজিক মাধ্যমের সদর্থক দিকগুলো। যা লেখককে প্রতিষ্ঠিত হতে ভীষণভাবে সাহায্য করে। তবে এই মাধ্যমের বিপরীত দিকও রয়েছে। অর্থাৎ এর ব্যবহারের কুফল। হ্যাঁ, কুফল বা নঞর্থক দিকও অতি অবশ্যই রয়েছে এবং সেসবও নেহাত ফ্যালনা নয়। লেখকদের সৃষ্টিশীলতার সাড়ে সব্বোনাশ করতেও এই মাধ্যমের জুড়ি মেলা ভার।

সামাজিক মাধ্যমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ, এটি সময় নষ্ট করার আদর্শ জায়গা। রাইটার্স ডাইজেস্ট-এর প্রবীণ সম্পাদক বরার্ট লি ব্রিয়ার বলেছেন, ‘সামাজিক মাধ্যমগুলোয় অসীম স্ক্রলিং রাখা হয়েছে শুধু সময় নষ্ট করার জন্য।’

যেকোনো সৃষ্টিশীল কাজে চাই একাগ্রতা। চাই আত্মনিবেদন। ভাবনার সম্পূর্ণটুকু ঢেলে নিজেকে বিষয়টির সঙ্গে একাত্ম করা। আর এখানেই ভয়ানক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক মাধ্যম। বিশেষ করে ফেসবুক। ফেসবুক বা সামাজিক মাধ্যম লেখকদের ধ্যানস্থ হতে দেয় না। কোনো কিছু নিয়ে তলিয়ে ভাবতে দেয় না। একটার পর একটা ইস্যু আসে ফেসবুকের দেয়ালে। আর লেখকের সংবেদনশীল মন এসবে ভাবিত হয়। উদ্বিগ্ন হয়। নিজের আত্মমগ্ন পরিস্থিতি গুলে গুবলেট হয়ে যায়। কোনো একটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে তলিয়ে ভাবার সুযোগ দেয় না সামাজিক মাধ্যম।

সবচেয়ে বড় কথা, দু’শ লাইন ভালো লেখা পড়লে দশ লাইন লেখা যায়। যার পড়াশোনা যত বেশি, যার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান এবং জানার চাহিদা যত বেশি, তিনি ততই বহুমাত্রিক বহুমুখী বিষয় নিয়ে লিখতে পারবেন এবং তাঁর পড়ার পরিধির ব্যাপ্তি, অনুভূতির সার্থক প্রকাশই পারে সেই লেখকের সৃষ্টিকে কালজয়ী করতে। গুণগত মানসম্পন্ন লেখা ঋদ্ধ করে সাহিত্যের জগতকে।

কিন্তু অগভীর আধখ্যাচড়া জ্ঞান নিয়ে তো আর ভালো সাহিত্য কর্ম আশা করা যায় না। অগভীর ভাবনার কোনো লেখা আজ পর্যন্ত কালোত্তীর্ণ হয়নি। সুতরাং ভালো ও মানসম্পন্ন লেখা লিখতে হলে, প্রতিষ্ঠিত লেখক হতে হলে সামাজিক মাধ্যমে নিজের পোস্ট করা লেখার আলটপকা

মন্তব্যের (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে) সোনার হরিণের পেছনে না ছুটে সিরিয়াস অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে লেখার পাশাপাশি। যা ফেসবুকে বা অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে থাকলে একেবারেই সম্ভব নয়। এখানে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করতেই হয়। সামাজিক মাধ্যমে সবার পছন্দের ‘জোনর’ অনুযায়ী আলাদা আলাদা পাড়া আছে। যেমন- কবিতা, গল্প, ছবি তোলা, ছবি আঁকা,বইপড়া, বইয়ের সমালোচনা আরও কত কত....! আর ঐসব পাড়ার অধিবাসীরা সবাই সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে চর্চা করেন। কাজেই আপনার পোস্টে কমেন্ট করলে আন্তর্জালের এ্যালগরিদম অনুযায়ী সেই কমেন্ট কর্তার করা পোস্ট আপনার দেয়ালে বারবার ভেসে উঠবে। কিংবা আপনিও সৌজন্যবশত তাঁর পোস্টে গিয়ে কমেন্ট করে এলেন। এই যে পারস্পরিক পিঠ চাপড়ানো, এতে করে সঠিক এবং নিরপেক্ষ সমালোচনা থেকে আপনি বঞ্চিত রয়ে গেলেন। যা হয়তো পরবর্তীতে নিজের লেখাকে আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হতো।

সামাজিক মাধ্যমের আরেকটি ভয়ঙ্কর দিক হচ্ছে মেধাস্বত্ব চুরি। আমেরিকান একজন বাঙালি তাঁর পরবাসের শোক ভোলার চেষ্টা করছেন নিজের সামাজিক মাধ্যমের দেয়ালে। লিখছেন কবিতা, ছড়া, অণুগল্প, ছোটগল্প। তাঁর এসব সৃষ্টি ভেসে বেড়াচ্ছে সামাজিক মাধ্যমের এদিক ওদিকে। পশ্চিমা মাটিতে অশ্রুজল সিক্ত সেই লেখা পত্র পূবের কোন্ লিটলম্যাগকে প্রাঞ্জল করে তুলেছে, তা রচয়িতার ভাবনা ও ‘পহোচ’ এর অনেক অনেক দূরে। এভাবে নিজের অজান্তেই লেখকের মেধাস্বত্ব অপর এক অ-জানা লোকের নামে ‘ক্রেডিট’ হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান টিসিকে পাবলিশিং, বই বিক্রির ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার একেবারেই লাভজনক নয় বলে জানিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার টম করসন বলেছেন, ‘আমরা অনেক লেখকের সঙ্গে কাজ করেছি এবং দীর্ঘদিন গবেষণার পর একটি দুঃখজনক সত্যে উপনীত হয়েছি। সত্যটি হচ্ছে, আপনার বই বিক্রির উদ্দেশ্য থাকলে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করা একদমই উচিত হবে না।’

বৃহত্তর পাঠক মহলে পৌঁছে যাওয়ার সহজ উপায় হিসেবেও যদি সামাজিক মাধ্যমকে ব্যববহারের ইচ্ছে থাকে, সেখানেও পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলছে। ফেসবুকের অর্গানিক পোস্টের রিচ ২০১২সালে ছিল ১৬ শতাংশ। আর বর্তমানে তা কমে হয়েছে এক শতাংশ। অর্থাৎ **আজ থেকে দশ-এগারো বছর আগে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১৬ জন আপনার পোস্ট দেখতে পেতেন। এখন দেখতে পান মাত্র একজন। সুতরাং ফেসবুকে অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই।** তবে হ্যাঁ, আপনি যদি টাকা খরচ করে আপনার পোস্ট বুস্ট করতে পারেন, তাহলে ফেসবুক আপনার পোস্ট বেশ কিছু সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছে দেবে। সেই সংখ্যাও খুব একটা বিশাল হবে বলে মনে হয় না।

প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য ব্রতীদের কথা বলছি না। তাঁরা নমস্য। তাঁরাই বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই উত্তরসূরীদের আকর্ষণ তৈরি করে দিয়েছেন। একবার ভেবে দেখুন তো, রোজকার তালিকায় নিজের পড়ার জন্য কতটুকু সময় বেঁধে দেওয়া আছে ! রোজ কি নিয়ম করে অন্তত একঘণ্টা পড়াশোনা হয় ! দৈনন্দিন জীবনের চাপের মধ্যে সেটা প্রায়ই হয়ে ওঠে না। তবে সামাজিক মাধ্যমে অভ্যেসবশতই ন্যুনতম এক-দেড়ঘণ্টা সময় চলেই যায়। বিখ্যাত গবেষণাপ্রতিষ্ঠান স্ট্যাটিসটা বলেছে, বেশিরভাগ ফেসবুক ইউজার প্রতিদিন গড়ে ২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট সময় ফেসবুকে ব্যয় করেন। টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবসহ আরও অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম তো আছেই। সব মিলিয়ে দিনে কত সময় ব্যয় হয়, ভাবুন। এত সময় যদি সামাজিক মাধ্যমেই ব্যয় করেন, তাহলে নিজের লেখাটা লিখবেন কখন? কাজেই এই সময়টুকু নিজের লেখায় দিলে বছরে অন্তত তিনটি প্রমাণ সাইজের বই লিখে নিতে পারবেন।

সবদিক বিবেচনা করে এটুকু অবশ্যই বলা যায় যে- সামাজিক মাধ্যমের ভালো দিকগুলো গ্রহণ করে এর নেশালু আকর্ষণকে বর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে লেখককেই বেছে নিতে হবে এর সঠিক পরিকল্পনা মাফিক ব্যবহার।

<><><><><><>

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায় আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ।

অল ইণ্ডিয়া যুব যাদব মহাসভা

ভোলানাথ যাদব
সভাপতি
অসম যুব যাদব মহাসভা

কিশোর যাদব
সভাপতি
হাইলাকান্দি জেলা যুব যাদব মহাসভা

শুভ শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায় আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন

হাইলাকান্দি জেলা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থা, হাইলাকান্দি

শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জীবনে সুখ, শান্তি নিয়ে আসুক এই শুভ কামনায়

মুক্তার হুসেন চৌধুরী
লীনা দেব
আহ্বায়ক

সৌমেন ভট্টাচার্য
মূখ্য আহ্বায়ক,

উপেন্দ্র ঘোষ
শ্যামল দাস
আহ্বায়ক

হাইলাকান্দি জেলা মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষক সংস্থা, হাইলাকান্দি

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ছাব্বিশে মুখোমুখি হিমন্ত-গৌরব

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মাঝেও অসমে এগিয়ে এন.ডি.এ.

মনজুর আহমেদ বড়ভুঁইয়া

২০২৬ সালের ২ মে বর্তমান রাজ্য সরকারের কার্যকাল শেষ হচ্ছে। তাই ২০২৬ সালের মার্চ এবং এপ্রিলের মধ্যভাগেই এসে বিধানসভার নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। এই হিসেবে আগামী বছরের দুর্গোপূজার আগেই অসমে নয়া সরকার থাকছে. এমন আবহে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কী তৃতীয়বারের মত শাসনাধিষ্ট হচ্ছে? যেমনটা হয়েছিল পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের আমলে। ২০০১ সালে অসম গণ পরিষদকে গদিচ্যুত করে রাজ্যে তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একটানা ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। ২০১৬ সালে বিজেপি প্রথমবারের মত সরকার গঠনের পর হিমন্তবিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। ২০২১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর নির্বিবাদেই কার্যকালের শেষান্তে পৌঁছেছেন তিনি। তাই পুনরায় কী তিনি মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসছেন, তা নিয়ে বেশ ঔৎসুক্য।

অথবা তাঁর প্রতিদ্বন্ধী হিসেবে সর্বভারতীয় কংগ্রেস যাকে প্রজেক্ট করেছে, সেই গৌরব গগৈ কী অসম কংগ্রেসকে হৃত শাসন ফিরিয়ে দিতে পারবেন। না, কংগ্রেসকে আরও পাঁচ বছর বিরোধী আসনে বসেই ফের ক্ষমতার মোহ দেখতে হবে। এমনসব অগণিত চর্চা নিয়ে রাজ্য রাজ্যনীতি চলমান। আরও ব্যাখ্যা করে বললে, অতীতের মত '২৬শের রাজনীতিও কী ধর্মীয় বিভাজন, আঞ্চলিকতাবাদ, জাতিগত পরিচয়ের গণ্ডীতে বাধা পড়বে। অথবা উত্তরণ ঘটবে। সমসাময়িককালে ভোটার চরিত্র এতটাই আত্মমুখী হয়েছে যে প্রাক নির্বাচন পর্বে কিছু হলফ করে বলতে পারছেন না পোড়া খাওয়া সেফোলজিস্টরাও। কিন্তু এতসবের মধ্যেও সর্বভারতীয় একটি সমীক্ষা গোষ্ঠীর **সমীক্ষা বলছে যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদের মুখ হিসেবে হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং গৌরব গগৈ সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছেন।** দল হিসেবে এখনও বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট এগিয়ে থাকলেও ১২৬ বিধায়কের মধ্যে ৭৫ শতাংশকেই অপছন্দ করছেন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটাররাই।

দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো, ভোট সংক্রান্ত পরিসংখ্যান এবং ভোটার চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে লোকনীতি-সিএসডিএস (সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব ডেভলাপিং সোসাইটিজ)। মূলত অনুসন্ধিৎসু, নিরপেক্ষ এবং বাস্তবমুখী সমীক্ষার জন্য সংস্থাটির সুনাম রয়েছে। এজন্য সংস্থাকে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর রোষের মুখে পড়তে হয়। চলতি বছরের আগষ্ট মাসে সংস্থার সেফোলজিস্ট সঞ্জয় কুমারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে খোদ নির্বাচন কমিশন। ঘটনা হচ্ছে, এই সংস্থাটি ২০২১ সালে অসমে বিধানসভা নির্বাচনের পর একটি সমীক্ষা করেছিল। সেই রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। এবার ২০২৬ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি সমীক্ষা করেছে। এই সমীক্ষা মতে, চূড়ান্ত পর্যায়ের বিভাজিত রাজনৈতিক পরিবেশে ২৬শের নির্বাচন হতে চলেছে। তবে জনবিন্যাসগতভাবে এর তারতম্যও ঘটবে।

লোকনীতি-সিএসডিএস-এর মতে, বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রতি তুমুল প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য রাজ্যের ৪৫.৬ শতাংশ হিমন্ত এবং ৪৪.৮ শতাংশ গৌরবকে পছন্দ করেছেন। দলগতভাবে বিজেপি জোটকে ৪৯.৮ শতাংশ এবং কংগ্রেস জোটকে ৩৯.৩ শতাংশ সমর্থন করেছেন। পুরুষ ভোটারদের মধ্যে ৫০ শতাংশ হিমন্ত এবং ৪১ শতাংশ গৌরবকে, আবার মহিলা ভোটারদের মধ্যে ৪৯ শতাংশ গৌরব এবং ৪১ শতাংশ হিমন্তকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। সংস্থাটি রাজ্যের বিভিন্ন বয়সীদের মধ্যেও সমীক্ষা চালিয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান যুব প্রজন্ম অর্থাৎ ১৮-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৫১ শতাংশ গৌরব এবং ৪৪ শতাংশ হিমন্তকে পছন্দ করছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করেছে। রাজ্যের ৫০.৫ শতাংশ লোকই

সরকারকে নিয়ে ক্ষুব্ধ। আর যুবাদের এই মাত্রা আরও অধিক। ৫৬ শতাংশই সরকার বিরোধী। তবে এমন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার চেয়েও আরও ভয়ানক ছবি ধরা পড়েছে ১২৬ বিধায়কের ক্ষেত্রে। ৭৫ শতাংশই তাদের বিধায়ককে চান না। এদের মধ্যে ৪০ শতাংশ নয়া মুখ এবং ৩৫ শতাংশ বিধায়কের পরিবর্ত হিসেবে অন্য কাউকে দলীয় মনোনয়ন চান।

উল্লেখ করতে হচ্ছে যে ২০২১ সালের নির্বাচনের পরপরই অর্থাৎ ২৮ মার্চ থেকে ২১ এপ্রিলের মধ্যে সংস্থাটি রাজ্যের ৩৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের ১৪০ টি পোলিং বুথে ৩৪৭৩ জন ভোটারের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। ওই সমীক্ষায় তারা প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিল যে ভোট শেষ হয়েছে, এখন আপনি কাকে মুখ্যমন্ত্রী চান ? তখন সর্বানন্দ সোনোয়ালের পক্ষে ৪০১, হিমন্তের পক্ষে ৩৭০, রঞ্জিতকুমার দাস ৬, চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি ৫, অতুল বরা ৮, প্রমোদ বড়ো ১৯, গৌরব গগৈ ৪২৮, রিপুন বরা ১৭৮, রকিবুর হোসেন ৯, সুস্মিতা দেব ৭, দেবব্রত শইকিয়া ১০, প্রদ্যুৎ বরদলৈ ৫, বদরুদ্দিন আজমল ৯৫, হাগ্রামা মহিলারি ৮, অখিল গগৈ ৩৭, লুরিণজ্যোতি গগৈ৮৮ এবং প্রফুল্লকুমার মহন্তের পক্ষে ১ জন মত দিয়েছিলেন।

অবশ্য এটাও ঘটনা, ২০২১ সালে গৌরব গগৈ এপিসিসি সভাপতি ছিলেন না। দায়িত্বে ছিলেন রিপুন বরা। পরে সভাপতি হন ভূপেন বরা। রিপুন বরা দলত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। ফের কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেছেন। চলিত বছরের ৩ জুন মাত্র গৌরব সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি যুগপৎভাবে লোকসভায় বিরোধী উপদলনেতাও। পাশাপাশি গত লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে অনুষ্ঠেয় পাঁচ বিধানসভা উপনির্বাচনে টিকিট বন্টন নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে মতানৈক্যের জেরে জোট থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায় কংগ্রেস। অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটে টুকটাক সমস্যা থাকলেও ক্যারিশ্মা দিয়ে বাজিমাৎ করার নৈপুণ্য রয়েছে বিজেপি এবং হিমন্তের।

কিন্তু বিজেপিকে যে খালি মাঠ দিতে কংগ্রেস মোটেই প্রস্তুত নয় তা বোঝা যায় তাদের প্রস্তুতিতে। বিশেষ করে গৌরব গগৈ নেতৃত্বে আসার পর সংগঠন উজ্জীবিত হয়েছে বলা যায়। নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় ভোটার পুনরীক্ষণকে সামনে রেখে এপিসিসি একযোগে ২৮৮০ বুথ লেভেল এজেন্টকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে। গত ১৪ আগস্ট থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আর উপনির্বাচনের পর রাজ্যে মিত্রজোট থেকে কংগ্রেস পৃথক হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় কী অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে ? এমন প্রশ্নে কংগ্রেস বলছে যে আগে তাঁরা তৃণমূলস্থরে সংগঠনকে মজবুত করে সিভিল সোসাইটি এবং বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে অসমকে গড়ার একটি রূপরেখা প্রস্তুত করতে চায়। এর পরে জোট গঠন। স্বভাবতই এমন পদক্ষেপে রাজ্যের বিজেপি বিরোধীদের মনে আশার আলো সঞ্চারিত হয়।

যদিও হাল আমলে ভোটার চরিত্র বোঝা বেশ কঠিন। কখন কার ওপর সদয় হবে, তা বুঝতে অনুমান নির্ভর হতে হয়, সঠিক পূর্বাভাস হয় না। এসব নানা টানাপোড়েন, নানা সমীকরণ শেষেই স্থির হবে ২০২৬-এর ভোটচিত্র।

<><><><><>

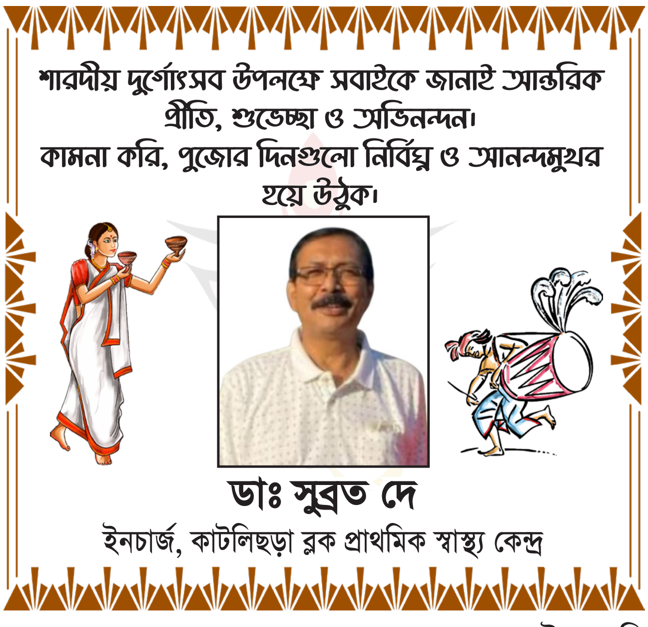

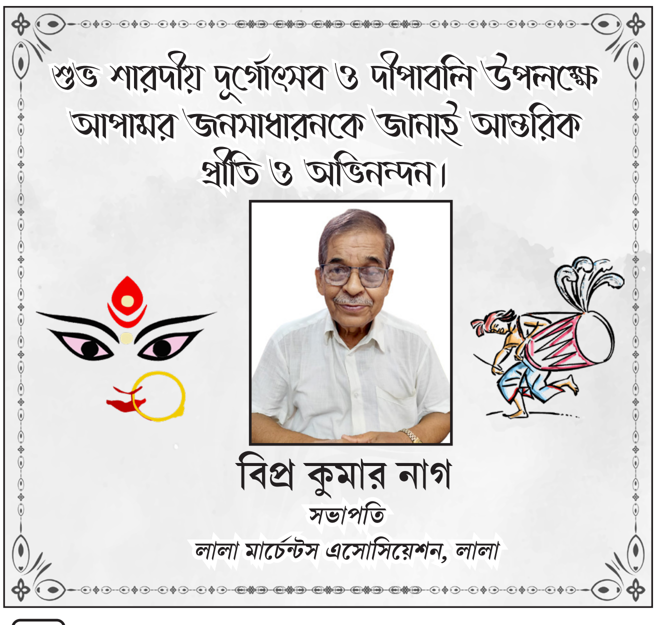

ভোট চর্চা

হাইলাকান্দিতে কংগ্রেস – বিজেপির পুনরুত্থান

নইমুল ইসলাম চৌধুরী

একুশে বিজেপি, বাইশে কংগ্রেস। জনবিন্যাসের নিরিখে আপাতত এই সম্ভাবনা নিয়েই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে চলেছে হাইলাকান্দি জেলার নবগঠিত দুটি কেন্দ্র। এতে ১২১ নম্বর হাইলাকান্দি কেন্দ্রে শেষপর্যন্ত শাসক দল বিজেপির তুরুপের তাস হতে পারেন রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী কৌশিক রাই। বলা যায়, এই রণনীতি এখনও ভ্রুণের পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম তনয় তথা **প্রাক্তন বিধায়ক রাহুল রায়ের রাজনৈতিক পুনরুত্থান ঠেকানোর জন্য শেষপর্যন্ত শাসক দল বিজেপির চমকপ্রদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনার কথা মোটেই নস্যাৎ করেনি দলের এক শীর্ষ সূত্র।**

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের এপ্রিল কিংবা মে মাসে। এরজন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই জেলায় এখন থেকেই রাজনীতির গতর গরম। এতে দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তির কুচকাওয়াজে রীতিমত সরগরম হয়ে উঠেছে কংগ্রেস-বিজেপি উভয় দলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। রাজ্যে বিধানসভা এবং লোকসভা এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর জেলার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র সঙ্কুচিত হয়ে এখন দুটিতে পরিণত হয়েছে। এতে নবগঠিত দুই কেন্দ্রের জন বিন্যাসের নিরিখে একটি করে কেন্দ্রে শাসক-বিরোধী উভয় দলের জয়ের সম্ভাবনা টগবগ করে ফুটছে। এরজন্য দুটি দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা এখন থেকেই যথেষ্ট উজ্জীবিত হয়ে উঠেছেন। বিশেষতঃ সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পর আগামী বছরের এই নির্বাচনে জেলায় পুনরায় গেরুয়া দলের খাতা খোলার এক নিশ্চিত সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পক্ষান্তরে, এক দশক পর রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের পক্ষেও জোরালো হাওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে এখন থেকেই দুই দলের মনোনয়ন রাজনীতি নিয়ে ভোট রসিক মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে তীব্র কৌতুহল। তাই উৎসবের অবকাশে 'হাইলাকান্দি' ম্যাগাজিনের পাঠকদের জন্য এই প্রতিবেদনের অবতারণা।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নবগঠিত হাইলাকান্দি কেন্দ্রে অনায়াসে জয় হাসিল করবে শাসক দল বিজেপি। জন বিন্যাসের নিরিখে এই সম্ভাবনাকে নিশ্চিত ধরে নিয়ে গেরুয়া দলের কথিত অনুশাসনের মধ্যে থেকেও মনোনয়ন রাজনীতি স্বমহিমাতেই চলছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এতে বিজেপির মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসাবে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে দৌড়ে রয়েছেন যুবনেতা ড০ মিলন দাস, মহিলা নেত্রী মুন স্বর্ণকার, জেলা সভাপতি কল্যাণ গোস্বামী সহ সুব্রত কুমার নাথ, রাজকুমার দাস, সৈকত দত্তচৌধুরী, স্বপন ভট্টাচার্য, বিমল বারোই এবং গোবিন্দলাল চ্যাটার্জি। এরমধ্যে নতুন মুখ হিসাবে এবার কল্যাণ গোস্বামী, স্বপন ভট্টাচার্য এবং বিমল বারোই প্রমুখ বিজেপির মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন। পক্ষান্তরে, পুরোনো বিধানসভা এলাকার আলগাপুর, হাইলাকান্দি এবং কাটলিছড়ায় পদ্ম ফুলের ছবি নিয়ে বাকি সবাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন ইতিপূর্বে। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ ঝুঁকিহীন ভাবে ভোটে জেতার লক্ষ্যে বিজেপির মনোনয়ন লাভের জন্য আলগাপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা গৌতম তনয় রাহুল রায়ও তলেতলে যথাসাধ্য তদ্বির করছেন বলে তাঁর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গতিবিধি বিবেচনায় বিভিন্ন সূত্র আন্দাজ করছে। কিন্তু এই আন্দাজ যদি সঠিক হয়, তবুও শেষপর্যন্ত রাহুলের এই তদ্বির কোন কাজে আসবে না বলে শাসক দলের এক সূত্রে একবাক্যে নস্যাৎ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অবশেষে পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিয়েই দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ভোটে লড়বেন রাহুল। এরজন্য যথারীতি কংগ্রেসের দুয়ারও খোলা রেখেছেন তিনি।

এই পটভূমিতে হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের ভাষিক ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠী ভিত্তিক ভোট সমীকরণের ফলাফল অবশেষে কি হতে পারে, এনিয়ে শাসক দলের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ বিচার-

বিশ্লেষণ চলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। একইভাবে রাহুল রায়ের ঘনিষ্ঠরাও নাকি সমান তালে এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে উভয় গোষ্ঠীর আপাত বিশ্লেষণের নির্যাস অনুসারে, হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে রাহুল রায় কংগ্রেসের প্রার্থী হলে রাজ্যে এক দশক শাসনের পর এই জেলায় বিজেপির খাতা খোলার সম্ভাবনা কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়ে উঠার আশঙ্কা রয়েছে । আর এই দুর্ভাবনা থেকে নিশ্চয়তার সন্ধানে শেষপর্যন্ত এখানে শাসক দলের প্রার্থী হিসাবে মন্ত্রী কৌশিক রাইয়ের নাম বিবেচনায় উঠে আসতে পারে বলে স্বীকার করেছে দলের এক নির্ভরযোগ্য সূত্র। তবে এনিয়ে আনুষ্ঠানিক কোন তৎপরতার খবর জানা যায়নি।

অন্যদিকে, জেলার অপর বিধানসভা কেন্দ্র **আলগাপুর-কাটলিছড়ায় এখন কার্যত কংগ্রেসের একতরফা দমকা হাওয়া ক্রমশ গতি লাভ করছে। এই হাওয়ার তোড়ে একদা জেলার সংখ্যালঘু রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি এআইইউডিএফের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ইতিমধ্যে শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছে।** বলতে গেলে, জেলার মুসলিম রাজনীতিতে গত কুড়ি বছর ধরে ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠা এআইইউডিএফের একচ্ছত্র আধিপত্যের চূড়ান্ত এই পতন ঘটেছে মূলত চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের সময়ে। এমতাবস্থায় চলতি পূর্বাভাষ অনুসারে বলা যায়, ১২২ নম্বর আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ৭০-৮০ শতাংশ জনমত বর্তমানে কংগ্রেসের পক্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একথা আঁচ করে এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের চলতি জোয়ার রীতিমত আকর্ষণীয় রূপ ধারণ করেছে । খবর অনুসারে, এখন পর্যন্ত এই জোয়ারে গা ভাসিয়ে সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় তৎপর রয়েছেন কাটিগড়ার দলীয় বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার, অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি জুবায়ের আনাম, প্রাক্তন জেলা

শারদীয় উৎসব উপলক্ষে হাইলাকান্দি জেলার সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

এই উৎসব সবার জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক এই শুভ কামনায় –

নজমুল হক লস্কর
খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক
কাটলিছড়া

পরিষদ সভাপতি আনাম উদ্দিন লস্কর, এপিসিসির সম্পাদক বদরুল ইসলাম বড়ভুইয়া, জেলা কংগ্রেসের উপ-সভাপতি তথা প্রাক্তন অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম মাঝারভুইয়া ও সামসুল হক বড়ভুইয়া সহ কংগ্রেসে নবাগত ইঞ্জিনিয়ার দিলোয়ার হোসেন মজুমদার প্রমুখ । অন্যদিকে, নেপথ্য থেকে তদ্বির করছেন অধ্যাপক হিলাল উদ্দিন লস্কর সহ এআইইউডিএফের দুই বিধায়ক যথাক্রমে সুজাম উদ্দিন লস্কর ও নিজাম উদ্দিন চৌধুরী। বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরীর তৎপরতার কথা সম্প্রতি তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। অপরদিকে, এস এস কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক হিলাল উদ্দিন লস্কর বর্তমানে সরকারি চাকরিরত অবস্থায় থাকায় নিজের দাবি নিয়ে এখনও সরাসরি প্রকাশ্যে আসতে দোটানায় রয়েছেন । কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক অনুগামী তাঁর মনোনয়নের জন্য অবিরত তদ্বির করছেন। মনে করা হচ্ছে, এই কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী চয়নে জনমতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটলে এক দশক পর জেলায় পুনরায় কংগ্রেসের খাতা খোলার সম্ভাবনা অনায়াসে নিশ্চিত হয়ে উঠবে।

হাইলাকান্দিতে এই মূহুর্তে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের সর্বাধিক চর্চিত বিষয় হচ্ছে জেলার বর্তমান তিন বিধায়কের রাজনৈতিক ভবিষ্যত কোনদিকে মোড় নিতে চলেছে। এতে মুখ রক্ষার খাতিরের কথা চিন্তা না করে সরাসরি যদি বলা হয়, তাহলে তিন জনেরই রাজনৈতিক ভবিষ্যত চরম অনিশ্চয়তার মুখে পৌঁছে গেছে বলে স্পষ্ট বার্তা পাওয়া যাচ্ছে । এরমধ্যে হাইলাকান্দির বিধায়ক জাকির হোসেন লস্করের অবস্থা সর্বাধিক শোচনীয় স্তরে বিরাজ করছে । একথা আঁচ করে ইতিমধ্যে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন বলেও বিস্তর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এই তুলনায় আলগাপুরের বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরী এখনও ময়দান ছাড়েন নি। বরং নবগঠিত আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় অবাধে বিচরণ করে হাল ফেরানোর চেষ্টায় তৎপর রয়েছেন তিনি। এরজন্য দুশ্চিন্তায় কাতর কাটলিছড়ার বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চাল দিয়ে বিরূপ পরিস্থিতিকে কাবুতে আনার জন্য সচেষ্ট রয়েছেন বলে আভাস পাওয়া গেছে। এতে জানা গেছে, শেষপর্যন্ত নির্দল প্রার্থী হিসাবেই ভোটের ময়দানে অবতীর্ণ হবেন তিনি। আপাতত বিজেপির মিত্র দল অগপর প্রার্থী হওয়ার চর্চা শোনা গেলেও অবশেষে এই পথে পা বাড়াবেন না বিধায়ক সুজাম । বরং বর্তমানে অত্যন্ত নিগূঢ়ভাবে চলা তৎপরতার মাধ্যমে কংগ্রেসের মনোনয়ন প্রাপ্তি অবশেষে সম্ভব না হলে এই দলের প্রার্থী মনোনয়নে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তিনি। সমান্তরাল ভাবে এআইইউডিএফ দল থেকেও একজন মুখবাজ প্রার্থীকে আমদানি করার কসরত চলছে। তবে শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক এই চাণক্যবুদ্ধি কতটা সফল হবে, সময় এবং পরিস্থিতি সেটা নিশ্চিত করবে।

<><><><><>

আলগাপুর-কাটলিছড়ায় চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে বিধায়ক সুজাম উদ্দিন

জুয়েল আহমেদ তাপাদার

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটকে লক্ষ্য রেখে হাইলাকান্দির দুটি বিধানসভা আসন থেকে লড়ে বিধায়ক হওয়ার তৎপরতা তুঙ্গে। দু'টির মধ্যে সর্বাধিক প্রার্থীর আনাগোনা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আলগাপুর - কাটলিছড়ায়। গত লোকসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রাপ্ত ফলাফল ভোটারদের গতিবিধি আঁচ করার সূচক হয়ে রয়েছে। এই আসনে কংগ্রেসের দিকেই ভোটারদের যে ঝোঁক, এনিয়ে রাজনৈতিক মহল প্রায় নিশ্চিত। তাই কংগ্রেস টিকিটের দাবিদারদের তালিকা ক্রমাগত দীর্ঘ হচ্ছে।

আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা আসনটি শাসকদল বিজেপির অনুকূলে নয়। আর বিজেপির সহযোগী অসম গণ পরিষদ থেকে প্রার্থী দিয়েও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসনে কাবু করা যে মুশকিল তা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রমাণিত। তাহলে কার সঙ্গে কার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে? রাজনীতির ময়দানে এমন প্রশ্নের জবাবে যে নামটি ঘূর্ণীয়মান,সেটি হচ্ছে কাটলিছড়ার বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর। তিনি কাটলিছড়ার দুই বারের বিধায়ক। এআইইউডিএফ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২০১৬ সালে কংগ্রেসের ডাকসাইটে প্রার্থী প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়কে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো বিধানসভায় পা রাখেন তিনি। এরপর ২০২১ সালে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত নাথকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বারের মতো বিধায়ক হন ।

তথ্য বলছে, ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তাঁর ভোট প্রাপ্তির হার বেড়েছে। যে কারণে হিন্দু ভোটার সংখ্যাধিক্য থাকা কাটলিছড়া আসনেও সেবার তিনি বিজেপি প্রার্থী সুব্রত নাথকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ৫০৬৭৬ ভোট পেয়ে কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী পাঁচ বারের বিধায়ক চার বারের মন্ত্রী গৌতম রায়কে ১৫০৮৪ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে ছিলেন।গৌতম রায় পেয়েছিলেন ৩৫৫৯২ ভোট।আর ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত নাথকে ১৩৪৩২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেও সুজাম পান ৭৯৭৬৯ ভোট। আর সুব্রত আটকে যান ৬৬৩৩৭ ভোটে। এর আগে ২০০৭ সাল থেকে দুইবার লাগাতার পূর্বতন রংপুর-রামচণ্ডি জেলা পরিষদ থেকে সুজাম ও তাঁর স্ত্রী ফরহানা খানম লস্কর বিজয়ী হয়েছিলেন। তিনি বিধায়ক হওয়ার পর ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে স্ত্রী ফরহানা খানম লস্কর রংপুর - রামচণ্ডিপুর জেলা পরিষদ আসন থেকে পুনরায় জেলার মধ্যে রেকর্ড ভোট পেয়ে জয়ী হন।সুজাম উদ্দিন লস্করের রাজনৈতিক লিগ্যাসি অনেক পুরণো।তাঁর পিতা প্রয়াত তজমুল আলি লস্কর কাটলিছড়ার দুইবারের বিধায়ক ছিলেন।১৯৬৭ সালের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী গৌরিশংকর রায় ১৯৮৩ সালে জয়নাথ রায়কে পরাজিত করে বিধানসভায় পা রেখেছিলেন তিনি।প্রয়াত জয়নাথ বাবুও কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন।সংখ্যালঘু দরদী এবং প্রতিবাদী কণ্ঠ তজমুল আলি লস্কর ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল

পর্যন্ত কাটলিছড়ার ভোটের ময়দানে লড়ে গেছেন। দুবার সফলতা আসলেও বাকি চারবার সামন্য ভোটে পরাজয়ের মুখ দেখেন তিনি।

এই লিগ্যাসিকে ধরে রেখে হাইলাকান্দির রাজনীতিতে ঠিকে রয়েছেন সুজাম উদ্দিন লস্কর।২০২৫ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও রামচণ্ডী -নিমাইচান্দপুর জেলা পরিষদ আসনে তাঁর একান্ত অনুগত দিলোয়ার হোসেন বড়ভূঁইয়াকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে ভোটে দাঁড় করিয়ে ভালো ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন। ওই আসনে আরেক প্রার্থীর পক্ষে আলগাপুরের বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরী সরাসরি নামলেও শেষমেশ হার মানতে হয়। ফলে ইউডিএফের দুর্দিনেও নিজের টিআরপি সতীর্থ বিধায়কদের তুলনায় ধরে রাখতে সক্ষম। শুধু তাই নয় গত দশবছরে মিজো আগ্রাসন,বিধানসভা ডিলিমিটেশন, পঞ্চায়েত ডিলিমিটেশন, অরুণোদয়,রেশন কার্ড বঞ্চনা সহ জেলার বিভিন্ন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে তাঁকে বিধানসভার ভিতরে কিংবা বাইরে সরব হতে দেখা গিয়েছে। এমনকি আইনি লড়াইয়েও নেমেছিলেন তিনি। ফলে সমালোচনার মুখেও তাঁর বিরোধীরা তাঁকে এখনো গণনায় রাখতে বাধ্য।

কিন্তু এবার অর্থাৎ ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের রাজনৈতিক পটভূমি ২০১৬ কিংবা ২০২১ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ডিলিমিটেশনে হাইলাকান্দি জেলার তিন বিধানসভা আসন কমে দুটি আসন হয়েছে। এখন আলগাপুর - কাটলিছড়া বিধানসভা আসনটি কাটাখাল- শান্তিপুর থেকে অসম -মিজোরাম সীমান্তবর্তী রামনাথপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বৃহৎ এলাকা। পূর্বতন আলগাপুর ও হাইলাকান্দি বিধানসভা আসনের যে সব এলাকা বর্তমান আলগাপুর- কাটলিছড়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ওইসব এলাকার জন্য তিনি নতুন। উপরন্তু বদর উদ্দিন আজমলের দলের আগের সেই অতীত গরিমা অন্তত বরাক উপত্যকায় নেই। হাইলাকান্দি জেলা থেকে তিনজন করে এআইইউডিএফের বিধায়ক দুই দুইবার করে নির্বাচিত হলেও এখন এই দলের জনপ্রিয়তা জেলায় নেই বললে চলে। গত লোকসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে এর প্রমান পাওয়া গেছে। তবুও ব্যক্তি সুজাম উদ্দিন লস্করের আলাদা এক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলে এখনও রাজনৈতিক মহলে চর্চিত । প্রায় দশ বছর থেকে অধুনা লুপ্ত কাটলিছড়া বিধানসভা আসনের প্রতিনিধিত্ব করা সুজাম উদ্দিন লস্করের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাও রয়েছে। বিরোধী দলের বিধায়ক হয়ে সব পক্ষকে সন্তুষ্ট করা কিংবা ব্যক্তিগত মুনাফা দেওয়া কঠিন কাজ।ফলে তাঁর এক সময়ের বিশ্বস্ত অনেক সহযোগী, কর্মী তাঁর কাছ থেকে সরে গেছেন। তাদের কাছে টানার ব্যাপারে বিধায়ক কি পদক্ষেপ নেবেন তা এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু কাটলিছড়ার হালফিলের রাজনৈতিক আবহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নিজের অনুগত কর্মীদের ক্ষোভ প্রশমনে পদক্ষেপ গ্রহন করা সুজাম উদ্দিন লস্করের ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। তবে বিধানসভা এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, পাকাসেতু নির্মাণ, শিক্ষার প্রসার - সহ বহু সার্বজনীন ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা,বিধায়ককে সহজে পাওয়ার বিষয়টি তাঁর রাজনৈতিক বৈরিরাও স্বীকার করেন।পাশাপাশি বিপদে-আপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো,এলাকার সমস্যা নিয়ে জেলার প্রশাসনিক শীর্ষ কর্তাসহ মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ - কাটলিছড়ার বিধায়কের গ্রহনযোগ্যতা এখন পর্যন্ত ঠিকিয়ে রাখার চাবিকাঠি বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান সুজাম উদ্দিন লস্করের এসব গুণাবলি রাজ্য রাজনীতিতে এক অন্য পরিচিতি এনে দিয়েছে। পিতা প্রয়াত বিধায়ক তজমুল আলী লস্করের স্বাধীন রাজনৈতিক আদর্শ, তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলন এবং কাটলিছড়ার জনকল্যাণের প্রতি অটল নিষ্ঠা সর্বপরি নীতিগত রাজনীতি এবং পরিষ্কার ভাবমূর্তি, রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং জনসেবার প্রতি অঙ্গীকারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসুরী হিসাবে সুজাম উদ্দিন লস্কর তা ধরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।যা কাটলিছড়ার বিধায়ককে সমালোচনার মুখেও ঘুরে দাঁড়ানোর অক্সিজেন যোগায় বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল। এক্ষেত্রে সুজাম উদ্দিন লস্করের সতীর্থ দুই বিধায়ক অধুনালুপ্ত আলগাপুর বিধানসভা আসন থেকে জয়ী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী ও হাইলাকান্দি বিধানসভা আসন থেকে নির্বাচিত জাকির হোসেন লস্কর নিজেদের জনপ্রিয়তা কিংবা রাজনৈতিক ক্রেজ ধরে রাখতে কার্যত ব্যর্থ হয়েছেন। এআইইউডিএফ থেকে তাঁরা দুজন নির্বাচিত হলেও বর্তমানে দল বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কৃত।নিজাম উদ্দিন চৌধুরী বর্তমানে রাইজর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রেখে চলেছেন। আর জাকির হোসেন লস্কর বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছেন। উদ্দেশ্য এজিপির টিকিট। রাজনৈতিক মহলে তাঁদের নিয়ে আপাতত খবর এটাই। এদিকে সুজাম উদ্দিন লস্কর এখনও দলে থাকলেও ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে এআইইউডিএফ থেকে যে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন না এটা প্রায় পরিষ্কার। তবে তিনি ভোটে লড়বেন এটা কিন্তু নিশ্চিত। তা হলে কোন দল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি? তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে কংগ্রেস দলে যোগদান করে ওই দলের টিকিটে ভোটে লড়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।ফলে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন বলে রাজনৈতিক মহলে খবর রয়েছে। তবে কংগ্রেসের টিকিট চাইলেও তো পাওয়া এত সহজ নয়।সাংসদ গৌরব গগৈর মত মেধা সম্পন্ন নেতা যখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বে। তাহলে কংগ্রেস টিকিট না পেলে কি নির্দল হিসাবে শেষমেশ ভোটে লড়বেন কাটলিছড়ার বিধায়ক?এনিয়ে সুজাম উদ্দিন লস্কর প্রকাশ্যে কিছু ঘোষনা না করলেও ঘরোয়া আলোচনায় এমন ইংগিত দিয়ে রেখেছেন।

তবে কংগ্রেসের একটি মহল মনে করছে আলগাপুর- কাটলিছড়া আসনে এখন পর্যন্ত ওজনদার প্রার্থী হলেন সুজাম উদ্দিন লস্কর।তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, জনসংযোগ সর্বোপরি ভোট ম্যানেজমেন্টের দক্ষতা ওই আসনে কংগ্রেসের টিকিট পেলে কমেও কাষ্টিং ভোটের সত্তর শতাংশ তাঁর পক্ষে টানতে সক্ষম হবেন।আর এর প্রভাব হাইলাকান্দি আসনে পড়বে। আর সেখানে শক্তপোক্ত হিন্দু প্রার্থী দাঁড় করালে বিজেপিকে সহজে প্রত্যাহ্বানের মুখে ফেলতে পারে কংগ্রেস। এমন প্রেক্ষাপটে নির্দল প্রার্থী হলেও সুজাম উদ্দিন লস্করকে ঘিরেই ঘূর্নিপাক খাবে আলগাপুর - কাটলিছড়ার রাজনীতি। সুত্রের খবর এ বিষয়টিকে মাথায় রেখেই আলগাপুর- কাটলিছড়া আসনে প্রার্থী ঠিক করার চিন্তা ভাবনায় রয়েছে কংগ্রেসের প্রদেশ নেতৃত্ব। তবে হালফিলে কিছু রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত কাটলিছড়ার বিধায়কের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে।এসব কাটিয়ে উঠে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের জন্য কি কৌশল কাটলিছড়ার বিধায়ক গ্রহণ করেন তাই এখন দেখার।

<><><><>

রাজ্য রাজনীতি

শাসনের কর্তৃত্ব ও বরাক বিজেপির পরম্পরা

শংকর দে

কথায় আছে; রাজা বদলায়, রং বদলায়, কিন্তু দিন বদলায় না। তবুও, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে ভোটাররা নেতা নির্বাচন করে থাকেন। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে অত্যন্ত ব্যয়বহুল নির্বাচনী আবহে জোরদার সরগরম প্রচারাভিযান হয়। যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ, গলাবাজি নির্বাচনী প্রচারে মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আর থাকে ইশতেহার-এর চমক। **নির্বাচনপর্ব মিটে যাওয়ার পর ক্ষমতার রাজনীতিতে এসব গৌণ হয়ে যায়। নির্বাচনী ময়দানে যারা 'জনতা জনার্দন' ,পরে নেতাদের কাছে তাদেরই 'অনুগ্রহপ্রার্থী হতে হয়'। শাসকের রাজদণ্ডে চুরমার হয়ে যায় জনগণের সযত্নলালিত স্বপ্ন।** ঠিক যে ভাবে বরাক উপত্যকার এক বড় অংশের মানুষ শয়নে-স্বপনে-জাগরণে বিভোর ছিলেন বিজেপিকে নিয়ে ।সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির অবস্থান নিয়ে এই আলোকপাত।

অসমে বিজেপি-র জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল কাছাড় থেকে। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জনতা পার্টি - র প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই সেই অবিভক্ত কাছাড় জেলায় এই দলের প্রতি আমজনতার একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। এরপর এই পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বিজেপি এখানে বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্যদিয়ে চললেও ভোটের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। একেবারে শুরু থেকে যারা বিজেপি বা এর শাখা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের অনেকেই এখনও নানা ভাবে সক্রিয় রয়েছেন।আবার অনেকেরই জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস যখন ক্ষমতার তুঙ্গে, এ অঞ্চলে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল, তখন বিজেপি-র হয়ে বিরোধী দলের রাজনীতি করাটা এত সহজ ছিল না। কিন্তু বরাক উপত্যকায় পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষ বা তাঁদের উত্তর প্রজন্মের একাংশের কাছে বিজেপি যথেষ্ট ভরসার স্থল হয়ে দাঁড়ায়।' পার্টি উইথ অ্যা ডিফারেন্স' অর্থাৎ 'একটি ভিন্ন মূল্যবোধের দল 'হিসেবে বিজেপি-র যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, কিছু মানুষ তাতেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বিজেপিকে সমর্থন দেওয়া বরাক উপত্যকার বাঙালিদের কাছে এত সহজ ব্যাপার ছিল না। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ, পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের বঙ্গজীবন বিজেপি-র বিপরীত মেরুতে থাকা কমিউনিস্ট ভাবধারাকে পুষ্ট করেই শাসন ক্ষমতায় এনেছিলেন। এমনকি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছিন্নমূল বাঙালিরাও বিজেপিকে সমর্থন করার মতো অবস্থানে ছিলেন না। ওই সময় সন্ধিক্ষণে বরাক উপত্যকায় যারা বিজেপি-র পতাকা বহন করেছিলেন, দলের প্রতি দায়বদ্ধতা তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। ক্ষমতার রাজনীতিকে প্রত্যাহ্বান জানানোর মতো মানসিকতা ছিল তাদের। কিন্তু, এই দশ-এগারো বছরে বলা যায়, উল্টে-পাল্টে গিয়েছে হিসেবের খাতাটি। দিল্লির রাজ্যপাটে এগারো বছর ধরে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি। দশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে দিসপুরের ক্ষমতায়। ভিন্ন মূল্যবোধের দল হিসেবে বিজেপি কি পারছে শাসনক্ষমতার ব্যতিক্রমী আস্বাদন জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে? এই প্রশ্ন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বরাক উপত্যকায় এখন ছয় জন বিজেপি বিধায়ক। কাছাড়ে চার, করিমগঞ্জে দুই, হাইলাকান্দিতে নেই।পক্ষান্তরে, বরাকে এআইইউডিএফ পাঁচ, কংগ্রেস চারটে কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল। অথচ, ১৯৯১-য়ে বরাকে তিন জেলায় নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে বাজিমাত করে এখানে ঐতিহাসিক জয়ের সূচনা করেছিল বিজেপি। শিলচরে সমরেন্দ্রনাথ সেন, কাটিগড়ায় কালীরঞ্জন দেব ,সোনাইয়ে বদ্রীনারায়ণ সিং ,ধলাইয়ে পরিমল শুক্লবৈদ্য, উত্তর করিমগঞ্জে মিশনরঞ্জন দাস, দক্ষিণ করিমগঞ্জে প্রণবকুমার নাথ, পাথারকান্দিতে মধুসূদন তিওয়ারি, হাইলাকান্দিতে চিত্তেন্দ্র নাথমজুমদার। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জয়ী হয়েছিলেন শুধু একজন। ধুবড়িতে ধ্রুবকুমার সেন। শিলচর লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন কবীন্দ্র পুরকায়স্থ ,করিমগঞ্জে দ্বারকানাথ দাস। তখন যাঁরা বিধায়ক, সাংসদ হয়েছিলেন, তাঁদের জীবনচর্যা বিজেপির সুনামকে ক্ষুন্ন হতে দেয়নি। তখনকার শাসক কংগ্রেসের বহু নেতাই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিলেন। তৎকালীন বিজেপি বিধায়কদের কাছে যথেষ্ট প্রলোভনের মওকা এলেও তাতে তাঁরা প্রভাবিত হননি। বিজেপি নেতাদের এই ভূমিকা জনমনে আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল।১৯৯৬-য়ে বরাকে চারটে বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল বিজেপি ।কাটিগড়ায় কালীরঞ্জন দেব, শিলচরে বিমলাংশু রায়, পাথারকান্দিতে সুখেন্দুশেখর দত্ত, রাতাবাড়িতে শম্ভুসিং মালা।তখন অসমে বিজেপি সংখ্যা ছিল চার।অর্থাৎ,ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিজেপি কোনও আসনেই জয়লাভ করতে পারেনি। লোকসভায় শিলচর আসনে কবীন্দ্র পুরকায়স্থ হেরে গেলেও করিমগঞ্জে জয়ী হয়েছিলেন দ্বারকানাথ দাস। কিন্তু, দ্বারকানাথ দাস প্রয়াত হওয়ার পর ১৯৯৮-য়ে বিজেপি প্রার্থী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের নেপালচন্দ্র দাস। ১৯৯৮-য়ে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের 'ডাকসাইটে' নেতা সন্তোষমোহন দেবকে হারিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ জয় পেয়েছিলেন কবীন্দ্র পুরকায়স্থ।ওই সময় কেন্দ্রে অটলবিহারি বাজপেয়ী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত হন তিনি। ১৯৯৯-য়ের লোকসভা নির্বাচনে কবীন্দ্র পুরকায়স্থ লক্ষাধিক ভোটের

ব্যবধানে হেরে গিয়েছিলেন সন্তোষমোহন দেবের কাছে। অন্য দিকে, ২০০০-য়ে উপ-নির্বাচনে উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে জয়লাভ করেছিলেন মিশনরঞ্জন দাস। ২০০১-য়ে বরাকে যাঁরা বিজেপি বিধায়ক হয়েছিলেন,তাঁরা হলেন শিলচরে বিমলাংশু রায়, কাটিগড়ায় কালীরঞ্জন দেব, ধলাইয়ে পরিমল শুক্লবৈদ্য, উত্তর করিমগঞ্জে মিশনরঞ্জন দাস ।অসমে সব মিলিয়ে তখন আট বিজেপি বিধায়ক। ২০০৬-য়ে বরাকে জয়ী বিধায়করা ছিলেন ধলাইয়ে পরিমল শুক্লবৈদ্য ,বড়খলায় রুমি নাথ,উত্তর করিমগঞ্জে মিশনরঞ্জন দাস ,রাতাবাড়িতে শম্ভুসিং মালা।ওই নির্বাচনে বিজেপি রাজ্যে দশ আসনে জয়ী হয়েছিল।এই প্রথম এক অংক থেকে দুই অংকে পৌঁছে ।

২০০৯-য়ের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় কেবিনেট মন্ত্রী, প্রভাবশালী নেতা সন্তোষমোহন দেবকে পরাজিত করে ফের মর্যাদাপূর্ণ জয় পান কবীন্দ্র পুরকায়স্থ। কিন্তু, তাৎপর্যপূর্ণভাবে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে বরাকে পনেরোটি বিধানসভা কেন্দ্রের একটিতেও জয়ী হতে পারেননি বিজেপি প্রার্থীরা। রাজ্যে বিজেপির বিধানসভা আসন কমে হয়েছিল পাঁচ ।ওই নির্বাচনে কংগ্রেস ভালো ফল করেছিল ।কংগ্রেস পেয়েছিল ৭৮ আসন এবং তাদের জোটসঙ্গী বিপিএফ লাভ করেছিল ১২ আসন। দু'দল মিলিয়ে ৯০ আসন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে লোকসভা নির্বাচনে বিধায়ক সুস্মিতা দেব জয়লাভ করায় শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন হয়েছিল। ওই উপ-নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপকুমার পাল। ২০১১ - য়ের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভালো ফল নেতৃত্বকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী এবং দাম্ভিক করে তুলেছিল। এক দিকে, চরম দলীয় কোন্দল; অন্য দিকে, একাংশ নেতার দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা কংগ্রেসকে যে একেবারে খাদের মুখে ঠেলে দিয়েছে, সেটা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ মোটেই টের পাননি।আর এই সূত্র ধরেই ২০১৬-য়ের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পাঁচের জায়গায় ৬০ আসন এবং তাদের জোটসঙ্গী অসম গণ পরিষদ ১৪ কেন্দ্রে জয়ী হয়ে শাসন ক্ষমতায় আরোহন করে। ২০২১-য়ের নির্বাচনেও বজায় থাকে একই ধারা। বিজেপির প্রাপ্তি ৬০ আসন, জোটসঙ্গী অগপ ৯, ইউপিপিএল ৬।

১৯৯১ থেকে ২০১১, বরাক তথা অসমে বিজেপি রাজনীতির একটা অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।বিধানসভা ও সংসদে দলীয় প্রতিনিধিত্ব বিজেপি সংগঠনকে যথেষ্ট উর্বর করে তুলে।আর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯০, এই এক দশকে বরাকে বিজেপি প্রতিষ্ঠা পর্বের যে অধ্যায়, সেটা ছিল অনেক কন্টকাকীর্ণ।২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শাসন ক্ষমতায় আরোহনের মধ্য দিয়ে অসমে বিজেপিতে নতুন ধারার সূচনা হয় ।এই নয় বছরে শাসক এবং বিরোধী আসন , সিংহাসনের প্রভাব প্রকট হচ্ছে ক্রমশ।এই বিচার-বিশ্লেষণ এই কারণে হচ্ছে যে, বিজেপির ত্যাগের রাজনীতি কি এখন অন্তর্হিত ।ভোগসর্বস্ব রাজনীতির চাপে কি পিষ্ট "ভিন্ন মূল্যবোধের রাজনৈতিক দলটি?" বিভিন্ন মহলে গভীরভাবে উত্থাপিত হচ্ছে এই প্রশ্ন ।২০১৬ - র বিধানসভা নির্বাচনের প্রাকপর্বে অসমে বিজেপি-র নেতৃত্বে এবং সাংগঠনিক পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়।পাঁচমিশালী বিক্রিয়ায় ওলটপালট হয়ে যায় বিজেপি - রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি ।কংগ্রেস, অসম গণ পরিষদ-এর তাবড় নেতৃবৃন্দের আগমনে বিজেপিতে যে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়, তাতে ক্ষমতার আস্বাদন মিললেও ঠিক সে ভাবে প্রাণের সংযোগ ঘটছে না দলের আগেকার মূলস্রোতের নেতা - কর্মীদের ।অত্যন্ত জাঁকজমক করে সরকার তথা দলের বড় মাপের অনুষ্ঠান হচ্ছে নিয়মিত ।কর্পোরেট আদলে পরিচালিত হচ্ছে সব কিছু ।এত ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানের অর্থ কোথা থেকে আসে, তা অনেকের কাছেই বিস্ময়ের। বিশেষত, বরাকে বিজেপি-র অন্দরমহলে কান পাতলেই কোনও কোনও প্রবীণ নেতা-কর্মীদের মুখে এই কথাটুকু শোনা যায় যে, 'এ কোন পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছি?' অবশ্য,পাশাপাশি এই অভিমতও উঠে আসছে যে ,অন্তত দলটা তো ক্ষমতায় রয়েছে। এটাই তাঁদের কাছে 'সান্ত্বনা।'

অসমে বিজেপি মিত্রজোট সরকারে প্রথম পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অগপ থেকে আগত সর্বানন্দ সনোয়াল। আর এই পাঁচ বছর তো মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনে বসে দাপিয়ে রাজ্য শাসন করছেন কংগ্রেসের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত হিমন্তবিশ্ব শর্মা। কংগ্রেস সরকারে মন্ত্রীপদে আসীন থাকাকালীন হিমন্তবিশ্ব শর্মা পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন ।তিনি তেইশ বছর কংগ্রেসে ছিলেন । এরমধ্যে তরুণ গগৈ সরকারে তুখোড় মন্ত্রী ছিলেন তেরো বছরের মতো ।সর্বানন্দ সনোয়াল বা হিমন্তবিশ্ব শর্মা সরকারে আর যাঁরা নেতৃত্বে রয়েছেন, তাদের অধিকাংশই বিজেপি বা অগপ-র এক সময়কার দ্বিতীয়, তৃতীয় সারির নেতা ।বহু দিন ধরে যুক্ত বিজেপি নেতা - কর্মীদের ভিন্ন দল থেকে আসা এ সব নব্য - বিজেপিদের দাপট বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে হচ্ছে। এ ছাড়া তাঁদের কী-ই বা করার আছে? ২০১১-য়ের বিধানসভা নির্বাচনে অসমে যেখানে সাকুল্যে বিজেপির পাঁচ বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন ,সেখানে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে দল শাসন ক্ষমতায় আসবে, এটা অনেকেরই চিন্তা ভাবনার বাইরে ছিল। তাই অনেকটা 'পড়ে পাওয়া'শাসন ক্ষমতার জন্য পুলকিত না হওয়ার কোনও কারণ ছিল না তাঁদের। কিন্তু, যত দিন যাচ্ছে, বরাকে নিষ্ঠাবান বিজেপি কর্মী -সমর্থকদের যেন মোহভঙ্গ ঘটছে।নানা ভাবে হতাশা গ্রাস করছে তাদের। চোখের সামনে তারা দেখছেন, দলের একাংশের জীবনযাত্রা কী ভাবে রাতারাতি পাল্টে গিয়েছে ।প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি।' আলাদীনের প্রদীপ' - এর মতো কোথা থেকে এত অর্থ আসে, তা ঠাহর করা অনেকের কাছে দু:সাধ্য। অন্যদিকে জনগণের করের টাকায় যে সরকারি তহবিল; তা থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা হয়। অথচ সেখানেও ব্যক্তি প্রচারের দামামা বিধায়ক - সাংসদদের। দেশের অনেক রাজ্যে এধরনের সরকারি কাজের ফলকে বিধায়ক - সাংসদের নাম থাকে না।কাজের বর্ণনা, আর্থিক বরাদ্দ,

বর্ষ, উল্লেখ থাকে। কিন্তু এখানে কংগ্রেস আমলের মতোই জাহির করার প্রতিযোগিতা চলছে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বরাকে বিজেপির রাশ এখন যুব নেতৃত্বের হাতে ।রাজ্যে বরাক থেকে দুই মন্ত্রী।কাছাড় থেকে কৌশিক রাই, শ্রীভূমি থেকে কৃষ্ণেন্দু পাল। কৌশিক রাই এখন অবধি আগাগোড়াই বিজেপিতে। কৃষ্ণেন্দু পাল কংগ্রেস থেকে আগত বিজেপিতে । শুধু মন্ত্রিত্ব পদের নিরিখেই নয়, এর অনেক আগে থেকেই দু'জনই 'করিৎকর্মা 'হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। কৌশিক রাই ছাড়াও কাছাড়ে এখন যাঁরা বিজেপি বিধায়ক, মিহিরকান্তি সোম, দীপায়ন চক্রবর্তী, নীহাররঞ্জন দাস; তাঁরা দল করছেন দীর্ঘ দিন ধরে।এর মধ্যে মিহিরকান্তি সোম লাগাতার দু' বার বিধায়ক। দলের প্রবীণ নেতা পরিমল শুক্লবৈদ্য শিলচর তফসিলি সংরক্ষিত লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ। রাজ্যসভা সাংসদ হয়েছেন দলের পোড়খাওয়া নেতা কণাদ পুরকায়স্থ ।সেই দিক থেকে দেখতে গেলে কাছাড়ে বিজেপির কর্তৃত্ব কংগ্রেসের নবাগতদের হাতে তেমন নেই ।দেখা যাচ্ছে, দু-চার জন নব্য বিজেপি ২০২৬ - য়ের বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের জন্য দৌড়ঝাঁপ করলেও তাঁরা এখনও তেমন ধর্তব্যের মধ্যে নন।শ্রীভূমির চিত্রটা অন্য রকম ।সেখানকার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ কৃপানাথ মালা আগে ছিলেন কংগ্রেসে।রাজ্যের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল তো দীর্ঘদিন কংগ্রেস সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন ।কৃপানাথ ,কৃষ্ণেন্দু দু'জনই হিমন্তবিশ্ব শর্মা শিবিরের ।তাঁদের মতো আরও যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কাছে দল গৌণ, হিমন্তবিশ্ব শর্মা মুখ্য ।হাইলাকান্দি জেলায় চিত্তেন্দ্র নাথমজুমদার ছাড়া বিজেপির আর কেউ এখন পর্যন্ত বিধায়ক হতে পারেননি। আর এ জন্যই ধর্মীয় মেরুকরণের ভিত্তিতে জেলার একটি আসন কমিয়ে বিধানসভা কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে, যাতে আগামী নির্বাচনে বিজেপির কেউ বিধানসভায় জিততে পারেন।বাস্তবে কী হবে, সময়ই এর উপযুক্ত জবাব দেবে ।

এই রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রাজ্যে এক নাগাড়ে দু' বারের বিজেপি শাসন কাল নিয়ে চর্চার পরিসর ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।বিধানসভা নির্বাচন যখন দোরগোড়ায়, তখন প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির রাজনৈতিক আবহ সরগরম হবে, এটাই স্বাভাবিক ।এটা আলোচিত হচ্ছে যে, রাজ্যের বর্তমান সরকারের প্রতিনিধিরা জনগণের সামনে এমন কোনও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি, যা কংগ্রেস শাসনের সঙ্গে পার্থক্য সূচিত করে। বরং দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস আমলে যেসব দুর্নীতির সঙ্গে আপস করা হতো, সেই ধারা এখনও বহমান। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন দ্রব্যাদির অবৈধ পাচারে বহু চর্চিত 'সিন্ডিকেটরাজ' চলছে জোরকদমে। সুপারি থেকে কয়লা; বাদ যাচ্ছে না কোনও লাভের অংকই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হাত বদল হয়েছে শুধু। আবার, রাজনীতি ও ঠিকাদারি সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে উন্নয়নের দফারফা অবস্থা।একাংশ বিজেপি কর্মী - সমর্থকদের কাছে এটা আশ্চর্যজনক ঠেকছে যে, দলের সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা বিসর্জন দিয়ে কী ভাবে কিছু নেতা ব্যক্তিস্বার্থ পূরণে “ছয়কে নয় এবং নয়কে ছয়” করছেন। আত্মকেন্দ্রিক প্রচার তাঁদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের আগেকার প্রভাবশালী কিছু নেতার মতো বরাকের কোনও কোনও বিজেপি নেতাকে ঘিরে ‘ব্যক্তিপূজা’ হচ্ছে। কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে বিজেপি তথা মিত্রজোট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা দৃঢ়ভাবে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে থাকেন।কিন্তু, বরাকের প্রেক্ষাপটে বহু ক্ষেত্রেই তা বাস্তবতা বিসর্জিত বলে বিভিন্ন দায়িত্বশীল মহল মনে করেন। তা'হলে কি যুব নেতৃত্বের হাত ধরে বিজেপি বরাক উপত্যকায় সঠিক দিশায় এগোচ্ছে না? সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বে প্রথম পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পর হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন এই পাঁচ বছরের শেষ লগ্নে দলকে ঘিরে এ ভাবেই তাক করে আছে অনেক প্রশ্ন। দুই মন্ত্রী কৌশিক রাই এবং কৃষ্ণেন্দু পাল-ই এখন বরাকে সর্বেসর্বা। বিধায়কদের মধ্যেও কেউ কেউ খুবই 'করিৎকর্মা ।'

এই অঞ্চলের উন্নয়নের বিষয়টি দূরে সরিয়ে রেখেও যে মোক্ষম প্রশ্ন উঠে আসছে; তা হলো,এই নেতৃত্বের হাতে দলের ভাবমূর্তি আখেরে কতটুকু সুরক্ষিত? তবে সিংহাসনের মহিমায় দলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা কিন্তু ভাবাচ্ছে নিষ্ঠাবান কর্মী - সমর্থকদের ।

<><><><>

ফিচার

নয়া অভিবাসন নীতি অসমে ফের উসকে দিল উগ্র জাতীয়তাবাদ

বিভূতি ভূষণ গোস্বামী

২০২৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার অভিবাসন নীতি নিয়ে এক নতুন অধ্যায় শুরু করে। কার্যকর হয় ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স (এক্সেম্পশন) অর্ডার, ২০২৫। সদ্য প্রণীত ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স অ্যাক্ট, ২০২৫-এর অধীনে এই আদেশ ভারতীয় অভিবাসন আইনকে নতুন কাঠামো দেয়। বিচ্ছিন্ন পুরনো আইনগুলোকে একত্রিত করার পাশাপাশি এতে প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। সরকার এটিকে মানবিক উদ্যোগ বললেও অসমে রাজনৈতিক অস্থিরতা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কয়েক দশকের পুরনো জনসংখ্যাগত ভয় আবার উসকে উঠেছে।

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স অ্যাক্ট, ২০২৫ পুরনো ছকভাঙা নানা আইনকে বাতিল করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে নতুন রূপ দেয়। এর সঙ্গে জারি হওয়া ছাড়ের নির্দেশে (Exemption Order) তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা রয়েছে। প্রথমত, আগের মতোই নেপাল ও ভুটানের নাগরিকরা পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়াই নির্দিষ্ট স্থল ও আকাশপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, এবং সবচেয়ে বিতর্কিত অংশটি হলো—আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা (হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান), যারা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে ভারতে প্রবেশ করেছে, তারা বৈধ কাগজপত্র ছাড়া থাকার অপরাধ থেকে অব্যাহতি পাবে। তৃতীয়ত, ৯ জানুয়ারি ২০১৫-এর আগে ভারতে আশ্রয় নেওয়া নিবন্ধিত শ্রীলঙ্কার তামিল শরণার্থীরাও একই ধরনের ছাড় পাবেন।

তবে এই অব্যাহতি অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাগরিকত্বের পথ সুনিশ্চিত করবে না। এটি কেবল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাসন বা শাস্তির হাত থেকে সুরক্ষার ছাড়পত্র। এই "অন্তর্বর্তী" অবস্থাই বিতর্কের মূল, কারণ এতে এঁরা শাস্তি থেকে মুক্তি পেলেও পূর্ণ নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা পাননি।

এই আদেশের সবচেয়ে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে অসমে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ নিয়ে দীর্ঘ ইতিহাস ও ছয় বছরের **অসম আন্দোলন (১৯৭৯–১৯৮৫) শেষে আসাম চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৪ মার্চ ১৯৭১-এর পরে অসমে প্রবেশ করা যে কোনও বিদেশি, ধর্ম নির্বিশেষে, শনাক্ত ও বহিষ্কৃত হবে।** ভুক্তভোগীদের কাছে এই নয়া নির্দেশ নিঃসন্দেহে এক নয়া সুযোগ এনে দিয়েছে।

কিন্তু অন্যদিকে নয়া নির্দেশ ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে অসমের কট্টর অসমিয়া জাতীয়তাবাদী মহলে। আন্দোলনের প্রধান মুখ সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) রাজ্যজুড়ে অনশন ও বিক্ষোভ শুরু করেছে। তারা এই আদেশকে "সিএএ থেকেও বিপজ্জনক" আখ্যা দিয়ে বলেছে—এটি অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশিদের অসমে থাকার বৈধতা দেবে। ফলে আসাম চুক্তির মূল ধারাই খর্ব হবে -- এই তাদের ধারণা। শুধু তাই নয়, অসমে শাসক বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র শরিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ) বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। পার্টি জানিয়ে দিয়েছে, তারা ইমিগ্রেশন অ্যান্ড

শ্রদ্ধাঞ্জলি...

সন্তোষ কুমার মজুমদার

যেতে নাহি দিব হায়, তবুও যেতে দিতে হয়!
প্রিয়জন একে একে চলে যায়, এটাই সময়।

হাইলাকান্দি ম্যাগাজিন গোষ্ঠীর পক্ষে -

নুরুল মজুমদার, অমিত রঞ্জন দাস, কবির মজুমদার, নজমুল ইসলাম তাপাদার

ফরেনার্স (এক্সেম্পশন) অর্ডার, ২০২৫-এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবে।

আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল যেমন অসম জাতীয় পরিষদ (এজেপি) প্রভৃতিও আন্দোলনে শামিল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রকাশ্যে এই নির্দেশের সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এই সিদ্ধান্ত নির্বাচনের আগে রাজনৈতিকভাবে বিভাজন তৈরির কৌশল এবং এটি পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই পাশ করানো হয়েছে। ফলে অসমের এই স্পর্শকাতর প্রশ্নটি আবার জাতীয় পর্যায়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

তবে যে যাই বলুন না কেন, নতুন আইন তথা এক্সেম্পশন অর্ডার ভারতের অভিবাসন ব্যবস্থাকে আধুনিক ও কড়া করার উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। নকল নথি ব্যবহার বা ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা ও পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের বিধান আনা হয়েছে এই নির্দেশে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ব্যুরো অব ইমিগ্রেশন এখন মূল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিস-এর সঙ্গে মিলিয়ে বায়োমেট্রিক নজরদারি ব্যবস্থাও চালু হচ্ছে এই আইনে। রাজ্যগুলোকে অবৈধ বিদেশিদের জন্য ডিটেনশন সেন্টার স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু অসমের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যে এটি বাস্তবায়নে সরকার প্রবল প্রত্যাহ্বানের মুখে পড়েছে। কোন অভিবাসী ছাড়ের আওতায় পড়ছে আর কে অবৈধ, তা শনাক্ত করতে নিখুঁত রেকর্ড ও স্বচ্ছতা দরকার। অন্যথায় স্থানীয় মানুষের সন্দেহ আরও বাড়বে।

দেখা যাচ্ছে, অসমের কট্টর জাতীয়তাবাদীরা এই আইনকে কেন্দ্র করে নানা ওজর-আপত্তিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ফের অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা সামাজিক নিরাপত্তা ও জনসংখ্যার ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সাম্প্রতিক এনআরসি প্রক্রিয়ায় প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়ার ঘটনা এখনো টাটকা স্মৃতিতে আছে। নতুন নির্দেশে আরও 'বিদেশির' আগমন সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ও সম্পদের ওপর চাপ বাড়াবে বলে তাদের আশঙ্কা।

দ্বিতীয়ত, মানবিকতা বনাম স্বজাতিগত অধিকার। নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা মানবিক পদক্ষেপ হলেও এই কট্টর জাতিয়তাবাদীরা মনে করেন—**এর ফলে অসমিয়াদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। নাগরিকত্বহীন বহু মানুষ নয়া আইনি সুবিধাকে হাতিয়ার করে থেকে যাবে, যা সামাজিক অস্থিরতা ডেকে আনবে।** তৃতীয়ত, বাস্তবায়নের বোঝা। নতুন ডিটেনশন সেন্টার তৈরি, বায়োমেট্রিক নজরদারি চালু এবং অবৈধ অভিবাসীদের আলাদা করা প্রশাসনের জন্য কঠিন কাজ।

পরিস্থিতি জটিল। একদিকে মানবিক দায়িত্ব, অন্যদিকে সীমান্তবর্তী রাজ্যের ঐতিহাসিক সংবেদনশীলতা। কেন্দ্রের উচিত রাজ্যের ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসা। কাদের ছাড় দেওয়া হবে, আর কাদের বহিষ্কার করা হবে—সে ব্যাপারে স্পষ্ট প্রটোকল তৈরি জরুরি। একইসঙ্গে ছাড়ের আওতার বাইরে থাকা মানুষদের দ্রুত ডিপোর্টেশন-এর ব্যবস্থাও করতে হবে। শুধু ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রাখা সমস্যার সমাধান নয়।

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স (এক্সেম্পশন) অর্ডার, ২০২৫ নিঃসন্দেহে ভারতীয় রাষ্ট্রের জন্য এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের চ্যালেঞ্জ। অসমে ইতিহাস, আবেগ ও পরিচয়ের জটিল জাল এই পদক্ষেপে নতুন ক্ষত তৈরি করেছে। কেবল আইন জারি করলেই চলবে না—গঠনমূলক আলোচনা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছাই পারে মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে। মানবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অসমিয়াদের অধিকার রক্ষা নিয়ে তৈরি হওয়া ভয় নিরসনে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক উদ্যোগ এখন সময়ের দাবি।

<><><><>

শক্তির অভিব্যক্তি

'ধনং দেহি, যশো দেহি'

সবাইকে শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানায়

লালা মন্ডল বিজেপি, লালা

শরতের আনন্দ ঘন হিমেল স্পর্শের মধ্য দিয়ে আসা শারদীয় দুর্গোৎসব জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জীবনে বয়ে নিয়ে আসুক অনাবিল আনন্দ, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি

এই শুভ কামনায় -

অভিজিৎ আচার্য

সভাপতি, লালা মন্ডল বিজেপি।

বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন

সত্য ঘটনা

নিশা রাতের কান্না

অমিত রঞ্জন দাস

বর্তমান সময়কে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের জয় যাত্রা মানুষের জীবনকে অনেক সহজ সুন্দর এবং নিরাপদ করেছে। কু-সংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে পৃথিবী ব্যাপী সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভুত-প্রেত-প্রেতাত্মার কাহিনি আজকাল শুধুই বইয়ের পাতার গল্প হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। আধুনিক মনস্ক যেকোন মানুষ প্রেতলোকের অস্তিত্ব মানতে নারাজ। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদে চিকিৎসা শাস্ত্র এতটাই উন্নত হয়েছে যে, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকেও বাছিয়ে তুলতে সক্ষম আজকের চিকিৎসকরা। তবে সবকিছুর পরেও আজকের দিনে পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় সমস্যার সমাধান বিজ্ঞানের হাতের কাছে থাকলেও মৃত্যুর ওপারে কি আছে এনিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান নীরব নিরোত্তর। মৃত্যুর ওপার বলে আদৌ কোন জগত আছে কিনা প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বৈজ্ঞানিক সমাজের কাছেও নেই। কেননা ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভগবানের অস্তিত্ব প্রমান করে দিয়েছেন। আবার অনেক সাধক অশরীরী শক্তির উপস্থিতিও প্রমান করতে পেরেছেন। আর তাই সেই অনন্তকাল ধরে ভুত-প্রেত-প্রেতাত্মাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে রহস্য বিরাজ করছে। মাঝে-মাঝে সংসারে এমন কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে থাকে বুদ্ধিতে যার কোনো ব্যাখ্যা মিলে না। এধরণের ঘটনায় ভুতের অস্তিত্ব জানান দিলেও অনেকে আবার তা স্বীকার করতে চান না। এভাবেই যুগ যুগ ধরে ভুত-প্রেত আর প্রেতাত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলাচালে দুলছেন মানুষ। এই পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা জীবনে কোনো না কোন সময় অশরীরী শক্তির মুখোমুখি হয়েছেন। অশরীরী শক্তির মুখোমুখি হওয়ার এরকম এক ঘটনার সাক্ষী আমি নিজেও। যেখানে এক অশরীরী শিশুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে রাতের সেই ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে আমার কিছু বলার নেই। আমার ভুত দর্শনের সেই রাতের ঘটনাকে এখানে উপস্থাপন করছি মাত্র। সেই রাতের কথা মনে হলে আজও শরীর শিউরে উঠে। সে প্রায় কুড়ি বছর আগের ঘটনা। এই ঘটনার স্থান হচ্ছে হাইলাকান্দি জেলার লক্ষ্মীনগর চা বাগান। আমি তখন কলেজের ছাত্র। ভুত প্রেত এসবে বিশ্বাস না থাকা এক দামাল ছেলে আমি। শরীরের রক্ত তখন টগবগে। ফলে ভয় বলে কিছু নেই। এরকম এক সময় লক্ষ্মীনগর চা বাগানের প্রয়াত শিক্ষক প্রবীর চন্দ্র নাথের বাড়িতে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। প্রবীর বাবুর ছেলে প্রণব আমার বাল্যবন্ধু হওয়ার সুবাদে এই বাড়িতে আমার নিয়মিত আসাযাওয়া ছিল। যেহেতু প্রণবের বোনের বিয়ে ছিল বলে আমি বিয়ের দিন দুপুর থেকেই তাদের বাড়িতে ছিলাম। সে সময় আমার চলাফেরায় প্রধান মাধ্যম ছিল সাইকেল। এইচ এস এল সি পাশ করার পর বাড়ির লোক আমাকে একটি সবাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। সেদিন প্রণবদের বাড়িতে সেই সাইকেল নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর বিয়েবাড়িতে ধুমধাম চলতে থাকে। রাতে বর নিয়ে বরযাত্রীরা আসেন। লোকাচার মতো বিয়ে সম্পন্ন হয়। এরপর খাওয়াদাওয়া করে অনেকেই বাড়ি ফিরে যান। আমাকে তাদের বাড়িতে থেকে যাওয়ার জন্য বন্ধু প্রণব এবং তার বাড়ির লোকেরা অনেক অনুরোধ করলেও আমি রাজি হইনি। বিয়েবাড়িতে আত্মীয়স্বজন থাকায় এমনিতেই বাড়িতে লোকজন বেশি ছিলেন তাই আমি বাড়িতে গিয়ে ঘুমোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তাছাড়া আমার বাড়ি প্রণবদের বাড়ি থেকে দুকিলোমিটারের ভেতরে থাকায় বাড়িতে গিয়ে ঘুমানো স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ফলে তখন রাত একটার সময় আমি আমার সাইকেল নিয়ে প্রণবদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার সিংগালার বাড়িতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিই। শীতের রাত হওয়ায় মধ্যরাতের ঘন কোয়াশায় অনেক কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। তাই সঙ্গে থাকা টর্চ জ্বালিয়ে খুব ধীরে ধীরে সাইকেল চালিয়ে আনিপুর - মনাছড়া রোড ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। মনাছড়া -আনিপুর রোড দিয়ে চলাচলকারিদের অনেকেরই মনে থাকবে লক্ষ্মীনগর খেলার মাঠের বিপরীত দিকের রাস্তায় একটি ছোট মাপের লোহার সেতু ছিল। বর্তমানে অবশ্য মনাছড়া -আনিপুর রাস্তাটি অনেক প্রশ্বস্থ হয়েছে। লোহার ছোট সেতুর জায়গায় পাকা সেতু নির্মিত হয়েছে। মধ্যরাতে আমি সাইকেল চালিয়ে সেই

লোহার সেতুতে ওঠার পর কান্না ও গোঙানি শুনতে পাই। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে লক্ষ্য করি যে, বছর পাঁচেকের একটি শিশু সেই লোহার সেতুর পাশের রেলিং-এর উপর দিব্যি বসে আছে। আমার তখন মনে হয়েছিল যেহেতু বিয়ে বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছেন তাই কারো সঙ্গে এই শিশুটিও বিয়ে বাড়িতে এসেছে। চঞ্চল শিশু হওয়ায় সে এভাবে সেতুর রেলিং-এ উঠে বসেছে। তখন আমি সেতুটি পার হয়ে সাইকেল থামিয়ে আশপাশের কোনো বাড়ির এই শিশুটি এখানে এসে বসেছে কি না তা অনুধাবন করার চেষ্টা করি। একসময় আমি সেই শিশুটিকে লক্ষ্য করে স্থানীয় ভাষায় বলি “এই লেইকা ঘরে যা, হিয়া কি করছিস”। একথা বলে সাইকেলকে স্টেন্ডের উপর খাড়া করার জন্য সাইকেল থেকে নামি। তারপর সেতুর রেলিংয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি শিশুটি সেখানে নেই। আমি মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। তারপর ভাবি হয়তো পাশের কোন বাড়ির শিশু এখানে এসে সেতুর রেলিংয়ে বসেছিল। আমার কথা শুনে সে চলে গেছে। ব্যাপারটাকে আমি খুব স্বাভাবিকভাবে নিই। বাড়িতে চলে যাই এবং ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন যেহেতু জামাইযাত্রা হবে তাই দুপুরেই আমি প্রণবের বাড়িতে চলে যাই। তারপর একসময় আমি গল্পচ্ছলে আগের রাতে পাওয়া সেতুর রেলিং-এ বসে থাকা শিশুটির কথা সবাইকে বলি। আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই বলি যে, কার বাড়ির শিশুটি এভাবে বেপরোয়ার মতো এত রাতে রাস্তার সেতুর রেলিংয়ের উপর বসেছিল। আমি এই কথা বলামাত্রই বিয়েবাড়ির প্রায় সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কেউ কেউ আমি ঠিক আছি কিনা জানতে চান। তারপর তাদের অনেকেই আমাকে আশীর্বাদ করে বলে আমি ভাগ্যজোরে আমি বেঁচে গেছি। নতুবা আগের রাত আমার জীবনের শেষ রাত হতে পারত বলে তারা মন্তব্য করেন। প্রণবদের বাড়িতে জমায়েত হওয়া অনেকেই জানালেন কয়েকবছর আগে এই সেতুর নীচে নালার জলে একটি শিশু ডুবে মারা গিয়েছিল। আর তখন থেকেই গভীর রাতে এই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী লোকেরা একটি শিশুর গোঙানির আওয়াজ শুনতে পান। ফলে নিশা রাতের এই কান্নাকে তারা এক অতৃপ্ত আত্মার কান্না বলে জানান। এর আগেও নাকি এভাবে এই সেতুর উপর একটি শিশুকে বসে থাকতে দেখেছেন কেউ কেউ, আগের রাতে আমি যে শিশুটিকে দেখে একটি বাউন্ডুলে শিশু বলে ভেবে নির্ভয়ে তাকে ডাকাডাকি করেছিলাম। পরদিন দিনের আলোয় এই শিশু যে আসলে এক অশরীরী আত্মা ছিল একথা শুনে আমার হাত পা রীতিমতো ঠাণ্ডা হতে থাকে। ভয় ব্যাপারটা যে কি আমি তখন উপলব্ধি করি। সে রাতের সেই ঘটনা আজও মনে হলে আমার শরীরের রোম শিউরে ওঠে। সে রাতের সেই রহস্যময় শিশু আমার যাবতীয় বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্বাসকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। ইহলোক আর পরলোক নিয়ে শোনা কথার কোন ব্যাখ্যাই আমার কাছে মিলছিল না। আজও আমি আমার বিবেকের কাছে বার বার জানতে চাই তাহলে সত্যই কি পরলোক বলে কিছু আছে? ভূত-প্রেত-প্রেতাত্মার আদৌ কি কোন অস্তিত্ব আছে? যদি না থাকে তাহলে সেই নিশা রাতের শিশুটি কে ছিল, তার অস্তিত্বইবা কি? বুদ্ধিতে কোন যুক্তির ব্যাখাই মিলছে না। বিজ্ঞান আর বিশ্বাসের এই দ্বন্দ্বের আদৌ কি কোন শেষ নেই।

<><><><>

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায় আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

লালা পুলিশ স্টেশন

সর্বাবস্থায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন।

ট্রাফিক আইন মেনে চলুন।

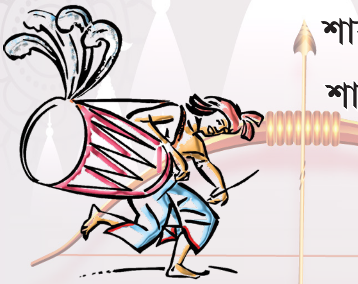

শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জীবনে সুখ ও শান্তি নিয়ে আসুক এই শুভ কামনায় -

রাজেন রংমাই
ওসি, লালা থানা

সাহিত্য

এক বিষন্ন সন্ধ্যার গল্প

রীতা চক্রবর্তী (লিপি)

হলুদ ডানার প্রজাপতিগুলো যেন হাওয়ায় তাদের ডানা মেলে দিয়েছে। নিষ্পত্র গাছগুলোতে সবেমাত্র বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। ফুলের কুঁড়ির মত পাতারা তাদের শীতের জড়তা কাটিয়ে উঁকি দিচ্ছে শাখাপ্রশাখায়। গেটের পাশেই একটি বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছ আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে সেই ঝিরিঝিরি পাতার কৃষ্ণচূড়ার ডালে দোলা লাগে। সেই দোলায় দোল খেয়ে হিমেল বাতাস ডানা ঝাপটিয়ে এসে ছুঁয়ে দিচ্ছে অবিনাশ বাবুকে। সেদিকে ওর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। অবিনাশ বাবু নির্বিকার বসে আছেন দুপুর তিনটে থেকে। আজকাল দুপুরে ঘুম আসে না বলে প্রতিদিনের অভ্যাস মত আজো ব্যালকনিতে ওর চিরকালের পছন্দের আরাম কেদারায় গা এলিয়ে আছেন। গায়ে একটা পাতলা আদ্দি কাপড়ের ফতুয়া ও ট্রাউজার পরে তিনি দূরের নারকেল গাছটির দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে চারপাশের বাস্তব পরিস্থিতি, শিরশিরে হাওয়া,ঘরে ফেরা পাখির দল, গোধূলি বেলার রঙিন সূর্যাস্ত সবকিছু উপেক্ষা করে তিনি কোন এক কল্পলোকে বিরাজ করছেন। এখন অবশ্য প্রায় প্রতিদিনই এককালের দুঁদে উকিল অবিনাশবাবুকে এই বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় আবিষ্কার করে কেয়ার টেকার কাম সর্বক্ষণের সঙ্গী রামলাল।

তখন বিকেল ছয়টা। বসন্তকাল বলে তখনো রাতের আঁধার এসে শহরটির দখল নিতে পারেনি। সবেমাত্র আলো আঁধারির খেলা শুরু হয়েছে। রামলাল নিত্যদিনের মত অবিনাশ বাবুকে ব্যালকনিতে বসিয়ে তখন রাতের খাবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সহজ সরল দেহাতি রামলাল এসেছে দূরের এক গন্ড গ্রাম থেকে। সে বহুকাল আগের কথা। যখন শহরের নামকরা উকিল অবিনাশ বন্দোপাধ্যায়ের ওকালতি ব্যবসা শুধুমাত্র সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই লড়াই করত, যখন সবাই একডাকে ওনার নাম শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করত এবং সবাই ধন্য ধন্য করত, ঠিক সেই সময়েই অনাথ রামলালকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন অবিনাশ বাবু কোন এক গন্ড গ্রাম থেকে। তখন এই দুঁদে উকিলের হুঙ্কারে রামলাল কেঁপে উঠলেও আজ যেন রামলালই অবিনাশ বাবুর অভিভাবক হয়ে গেছে। কালের করাল গ্রাসে সময়ের পাশা উল্টে গেছে। আসলে দুবছর আগে একদিন হঠাৎ করে রামলালের কর্তামা চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিতেই কর্তাবাবু কেমন যেন স্তব্ধ, বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন। আসলে এই বৃদ্ধ বয়সে এতবড় শোক তিনি একা একা সামলে উঠতে পারছেন না। ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছেন। একমাত্র মেয়ে বিয়ের পরই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। আসতে চাইলেও পাসপোর্ট ভিসার চক্করে পড়ে মায়ের শেষ কাজেও আসতে পারেনি মেয়েটি। এতে অবিনাশ বাবু আরো মুষড়ে পড়েছেন। একাকিত্ব ওকে গ্রাস করে নিচ্ছে। পাড়া প্রতিবেশী মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে এলেও খুব একটা বাক্যলাপ করতে চাননা তিনি। সারাদিন কেবল ব্যালকনিতে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকেন আর মাঝেমাঝে উঠে স্ত্রী অজন্তার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে যেন কী সব বলেন। রামলাল দূর থেকে দেখে আর প্রিয় মনিবের জন্য চোখের জল ফেলে। এইতো সেদিন ফ্যামিলি ডাক্তার এসে রুটিন চেকআপ করে বলে গেছেন, হার্টের অবস্থা একদম ভালো নয়, তার উপর এই মানসিক ব্যাধি,কর্তা বাবুর সময়মতো পুষ্টিকর খাওয়া ও ঘুমের খুব প্রয়োজন। কিন্তু কে শুনে কার কথা। রামলাল যতই সময়মতো সবকিছু যোগান দিকনা কেন, ইচ্ছে না হলে ছুঁয়েও দেখেন না তিনি।

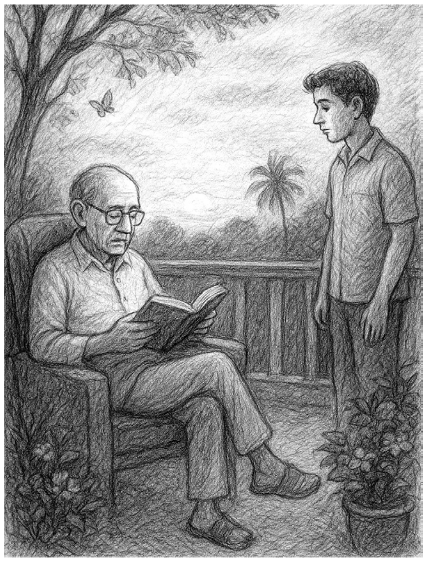

রাতের খাবার রুটি মাখতে মাখতে হঠাৎ রামলাল জানালা দিয়ে দেখল,বাইরে জোর হিমেল বাতাস বইছে। আকাশের রঙে ধূসর ছোঁয়া। সঙ্গে সঙ্গে হাত ধুয়ে সে ব্যলকনিতে এসে কর্তাবাবুকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করল। অন্যথায় ওর ঠাণ্ডা লেগে যাবে এই আশঙ্কায়। কর্তাবাবুকে আরো বলল সে, আকাশের রঙ জানান দিচ্ছে আজ ঝড় উঠবে। অবিনাশবাবু কিন্তু সেসব কথায় কর্ণপাত না করে শিশুসুলভ ভঙ্গিতে রামলালকে বললেন, তিনি এখন ঘরে চলে যাবেন যদি সে শপথ করে, বৃষ্টি থামলে আকাশের তারা গুনতে কর্তাবাবুকে সে ছাদে নিয়ে যাবে। কী আর করা! অগত্যা রামলালকে রাজী হতেই হলো। কারণ সে দেখেছে অবসরের পর গরম কালে স্ত্রী অজন্তাকে নিয়ে নিত্যদিন তিনি রাতে ফুলে ফলে সজ্জিত ছাদে চলে যেতেন। এই ছাদ বাগানটি ছিল কর্তামায়ের নিজের হাতে সযত্নে গড়া। তাই তিনি কী যেন এক মায়ার বাঁধনে আজো বাঁধা পড়ে আছেন সেখানে। প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই ছাদ বাগানে যাবার জন্য বায়না ধরেন। আজকাল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই তিনি উসখুস করতে থাকেন এবং খানিকবাদে রামলালকে নিয়ে ধীরে ধীরে ছাদে চলে যান। ওখানেই সান্ধ্য চা পৌঁছে

দেয় রামলাল। তারপর নানা গল্প কথায় কর্তাবাবুকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। অবিনাশ বাবু দু একটি কথার উত্তরে হুঁ হাঁ করেন আর দূর আকাশে তারাদের ভিড়ে নতুন তারাটিকে খুঁজে বেড়ান। রামলালকে একদিন দেখিয়েছেন,কোন তারাটি ওর কর্তামা। রামলাল এখন বুঝে গেছে,কর্তামার সান্নিধ্য পাবার জন্যেই সন্ধ্যা লগ্নে কর্তাবাবুর এই ছাদ বাগানে ছুটে ছুটে আসা।

গতকাল সারাদিন ছিল ঝড় তুফান ও মুষলধারে বৃষ্টি। আজ কিন্তু আকাশ একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। গতকালের মেঘলা আকাশ ছিঁড়েখুঁড়ে যেন একটুকরো নীলচে আকাশ সাদা দাঁতের পাটি বের করে হাসছে। এমন রোদ ঝলমলে দিনে রাতের আকাশ থাকে স্বচ্ছ ও নির্মল। গতকাল মেঘের সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি খেলা সাঙ্গ করে আজ আকাশ জুড়ে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠেছে। সঙ্গে অসংখ্য সোনালী তারার ঝিকিমিকি আলো। রামলাল দেখল,ছাদ বাগানটি যেন আজ আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। তাই সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসার একটু বাদেই সান্ধ্য চায়ের পর্ব সেরে নিজে উদ্যোগ নিয়ে কর্তাবাবুকে ছাঁদে নিয়ে গেল। যদিও আজ সকাল থেকেই তিনি ঝিমোচ্ছিলেন কিন্তু ছাদে যাবার নাম শুনেই প্রসন্ন মনে ভারি একটি পাঞ্জাবি গায়ে চাপিয়ে কর্তামার ছবির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথমে বিড়বিড় করে ছবিকে যা বললেন তার বিন্দু বিসর্গ রামলাল বুঝতে না পারলেও শেষের কথাটি কিন্তু রামলালের কানে এসে লাগল। ‘আমি আসছি অজন্তা, এক্ষুণি আসছি’ বলতে বলতে তিনি হাত বাড়িয়ে লাঠিটি বগল দাবা করে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন। পেছন পেছন রামলালও সঙ্গ নিল। ছাদে গিয়ে তিনি তার নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে পড়লেন। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন, অজন্তা দেবীর সযত্নে রচিত বাগানটি আজ আবার জোৎস্নালোকে খিলখিল করে হাসছে। তাইতো তিনি পরম প্রশান্তিতে চোখ বুজে রইলেন কিছুসময়। রামলাল লক্ষ্য করল, আজ যেন কর্তা বাবুর সিঁড়ি ভাঙতে একটু হাঁফ ধরেছে। সে একথা সেকথা বলে কিছু সময় বকবক করলেও কর্তা বাবুর যেন আজ কথা বলতে মোটেও উৎসাহ নেই। প্রায় ঘন্টাখানেক এভাবে অহেতুক বকবকের পর রামলাল বলল,সে নিচে গিয়ে রাতের খাবার রেডি করে এসে কর্তাবাবুকে নিয়ে যাবে। তিনি যেন আবার একা একা চলে না যান। এই বলে সে নিচে নেমে এলো। কিচেনে এসে রাতের দুধটুকু গরম করে দুটো রুটি সেঁকে নিল। সব্জি বিকেলেই বানিয়ে রেখেছিল। সেটা গরম বসিয়ে কর্তা বাবুকে নিয়ে আসবে বলে ছাদে চলে গেল। সিঁড়ির উপরের ধাপে এসেই সে দেখলো, মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে যেভাবে কর্তাবাবু চেয়ারে বসেছিলেন ঠিক সেভাবেই এখনো বসে আছেন। সে দূর থেকেই বলল, চলুন কর্তাবাবু আপনার খাবার গরম হয়ে গেছে। এরচেয়ে বেশি রাত হলে আপনার আবার অম্বল হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি কথার কোন জবাব দিলেন না। রামলাল একটু এদিক সেদিক ইতস্তত করে ঘুরে এসে আবার বলল আপনার লাঠিটা চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে রেখেছি। এবার সেটা নিয়ে উঠে পড়ুন। কর্তাবাবু কিন্তু অনড় অটল। রামলাল এবার একটু উসখুস করে,ইতিউতি পায়চারি করে কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠল। হিমশীতল শরীর তার কর্তাবাবুর! মাথাটিও একপাশে ঝুলে আছে কিন্তু ঠোঁটের কিনারে যেন লেগে আছে একটুকরো হাসির ঝিলিক। ঠিক তখনই রামলালের মুখ থেকে আকাশ বাতাস মথিত করে শুধু একটিই আর্তনাদ বেরিয়ে এলো ‘ কর্তাবাবু….!’

ডাক্তার এসে দেখে বলছিলেন, করার কিছুই নেই, সাডেন হার্ট এ্যাটাক। এখন দেওয়ালে দুটো ছবি পাশাপাশি ঝুলে থাকে। রামলাল প্রতিদিন বাগান থেকে ফুল তুলে দুটো মালা গেঁথে পরিয়ে দেয়। কিন্তু রামলাল আজো মনপ্রাণে বিশ্বাস করে, সেদিন কর্তামা এসেছিলেন কর্তাবাবুর একাকিত্ব ঘুচিয়ে ওকে নিয়ে যেতে। তাইনা বাগানটি ছিল এত উজ্জ্বল! কর্তামাকে দেখেই কর্তাবাবুর মুখে লেগে ছিল হাসির ঝিলিক এবং ছল করে তাকে নিচেও পাঠিয়েছিলেন এই কর্তামা-ই। এভাবেই রামলালকে ফাঁকি দিয়ে কর্তাবাবুর হাত ধরে স্বর্গের সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলেন কর্তামা…

<><><><><><>

শরতের আনন্দঘন হিমেল স্পর্শের মধ্য দিয়ে আসা শারদীয় দুর্গোৎসব জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জীবনে বয়ে নিয়ে আসুক অনাবিল আনন্দ, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি।

সঞ্জিত ঘোষ
সহ-সভাপতি ও প্রচার সচিব
ভারতীয় জনতা পার্টি, হাইলাকান্দি জেলা কমিটি ।

নীল বিচ্ছেদ

অলকা গোস্বামী

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। রাস্তার লাইট আর আকাশের কালচে নীল রঙ মিশে একটা মায়াবী আলোয় ভরে আছে চারদিক।

এরকমই আরো একটি সন্ধ্যায় ছিল বিচ্ছেদের কান্না, বিষাদের নিরবতা, আর নিরাশার মেঘ বৃষ্টি হয়ে অঝোরে ঝরছিল শিবানীর দুচোখ বেয়ে।

এই সময়টা খুব পছন্দের শিবানীর। নিজেকে খুঁজে পায় একান্ত ভাবে এই সময়টাতে। ছাদে পায়চারি করতে করতে কত কথা উপছে পড়ে স্মৃতির ভাড়ার থেকে।

ছোট্ট রিনি খেলায় মেতে আছে বন্ধুদের সাথে। "এই রিনি ঠাকুমা ডাকছেন, বাড়িতে অতিথি এসেছে, আর নূতন বন্ধুও এসেছে একজন"। পূর্ণিমা দিদির কথায় রিনি একছুট লাগায় বাড়ির দিকে, হটাৎ করেই পা পিছলে ধড়াম করে পড়ে যায় রিনি। "ইস দেখি দেখি , কপালটা তো ফুলে নীল হয়ে গেছে। কেন দৌড়াচ্ছিলি বলত"!

"আয় আয় ঘরে গিয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি"। পূর্ণিমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বাড়িতে ঢোকে রিনি।

বড়ো উঠান তার সামনেই রান্নাঘর, উল্টো দিকে ঠাকুর ঘর, আর বারান্দা। রিনি দেখলো বারান্দায় ওরই বয়সী একটি মেয়ে হাঁটুতে মুখ গুজে বসে আছে। আস্তে করে কাছে গিয়ে পিঠে হাত রাখলো রিনি। ওপাশ থেকে বিজন বলল," এই শিবানী চেয়ে দেখ তো তোর বোন রে, পিসতুতো বোন। ওর নাম রিনি।

মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল, দু চোখে নদী বইছে। ছপ ছপ একটানা শব্দ.....বৈঠার ঘায়ে নদীর জল সরে সরে যাচ্ছে। নৌকার ভিতরে গাদাগাদি লোক, বেশির ভাগই মহিলা, আর কিশোরী। অন্যদিনের মত সেদিনও বিকেলে আমিনা, আর সুলতানাদের সঙ্গে খেলতে গেছে শিবানী। খেয়াল করল আরে আজ তো রূপালী খেলতে এলো না। ঘরে ফিরে

মা কে জিজ্ঞেস করল," মা জানো রূপালি আজ খেলতে আসেনি, একবার চলো না দেখে আসি..."। শিবানী দেখল কেমন জানি বদলে গেছে মায়ের চোখ মুখ। চোখ দুটো যেনো চৈত্রের পলাশ।গত রাতেই রূপালিদের ধানের গোলাতে কারা যেন আগুন লাগিয়ে দেয়। সবাই যখন আগুন নেভাতে ব্যস্ত তখন ঘুমন্ত রূপালীকে উঠিয়ে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনার পর শিবানীর মা বাবা শিবানিকে ওদেশে পিসির বাড়ীতে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন।

"লক্ষ্মী মেয়ে, আমরা পরে একদিন যাব,এখন তোমার বই-পত্র, আর কিছু কাপড় গুছিয়ে নাও তো, আমরা একটু পরেই বেরিয়ে পড়ব"।

"কোথায় যাব আমরা...., ওই যে তোমার বিজন দাদা এসেছে। তোমাকে পিসির বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাবে।"

"তুমি যাবে না মা" ?

"যাব তো...., অনেক কাজ পড়ে আছে মা, তুমি বইপত্র কি নেবে দেখে নাও, আমি রান্না ঘরে আছি"।

সন্ধ্যে নামতেই শিবানীর মা, বাবা, শিবানীকে নৌকায় তুলে দিলেন। গলা জড়িয়ে ধরলো শিবানী, "মা, তুমি যাবে না" ?

"ভাই ছোট আছে তো আমরা কিছুদিনের মধ্যেই যাব। ওখানে তুমি বড় স্কুলে যাবে, কত কিছু শিখবে"।

মার কথায় শিবানী নৌকায় উঠে বসে। অস্ফুট কান্না দলা পাকিয়ে গলায় আটকে থাকে শিবানীর।

বাবা ধুতির খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে শিবানীর হাতে চুমু খেয়ে বলেন,"পিসির কথা শুনে চলো মা, নিজেকে ভালো রেখো। সম্মান রক্ষার জন্যে ওদেশে তোমাকে পাঠাচ্ছি। এভাবে যে আর কত নির্যাতন আমাদের উপর দিয়ে যাবে কে জানে! সময়ে অসময়ে, উৎসব পার্বনে কখন কার উপর খাড়া পড়বে কোন ঠিক নেই। আর কত ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে থাকা যায়।" গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে শিবানীর বাবার বুক চিরে। ছোট্টো শিবানী নৌকার ভিতরে এক কোনায় বসে পড়ে নদীর ঠাণ্ডা বাতাসে কখন ঘুমিয়ে পড়ে আর মনে নেই।নৌকো ওদের দুলালী গ্রাম ছেড়ে, শৈশব,মেয়েবেলা, পুতুল খেলা, রান্নাবাটি, সব একপাশে ফেলে দিয়ে বয়ে চললো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

সেই বন্ধু,সবুজ মাঠ, ধানের গোলা, ওদের কবলি, ধবলি গাই দুটোর কথা আজো মনে পড়ে। কিছু অনুভুতি কারো সাথে ভাগ করা যায় না। শুধু মুখোমুখি নিজের সাথেই করা যায়।

জন্মভূমিতে আর ফিরে যেতে পারেনি শিবানী হয়ত চায়ও নি। সত্যিই তো কোথায় যাবে !

ওদের সব কিছু জবরদখল হয়ে গেছে এতদিনে। ভাইকে নিয়ে মা বাবা ও চলে এসেছিলেন এদেশে। পিসির সহায়তায় একটা কাজও জুটে গেছে ভাইয়ের।

জান হয়ত বেঁচেছে এদেশে এসে। কিন্তু যোগ্য সম্মান, মর্যদা এখনও পাওয়া যায়নি। উদ্বাস্তুর তকমা এখনও সরেনি কপাল থেকে। পিসির একান্নবর্তী সংসারে সবাই খুব আপন করে নিয়েছিল শিবানীকে। রিনি নিজের বোনের থেকেও বেশি ছিল বন্ধু। একসাথে পড়াশোনা, ঘোরা ফেরা সবকিছুতেই ছিলো ওদের ভারি মিল। পিসি, পিসেমশাই এবং পরিবারের সাহচর্য না থাকলে হয়ত এই জীবন এতো সহজ হতো না শিবানীর। সেই কালো রাত পেরিয়ে, সকালে নৌকা যখন করিমগঞ্জ স্টিমার ঘাটে এসে পৌঁছাল। তখন সূর্য লাল আলো ছড়িয়ে নুতন দিনের সূচনা করছেন। আজ আবার এই করিমগঞ্জ শহরেরই সাব ইন্সপেক্টর হয়ে জয়েন করেছে শিবানী। খুব চাইছিল এই শহরেই যেন পোস্টিং হয়। এখনও অনেক রূপালিকে খুঁজে বের করতে হবে যে।

<><><><><>

রীনা ভাবী এবং

কবীর মজুমদার

আমার একটা স্বপ্ন ছিল- শ্রাবন্তীকে বিয়ে করবো। শ্রাবন্তীর বিয়ের পরেও স্বপ্নটা ভাঙেনি। এমনকি আমি বিয়ে করার পরেও না।

শ্রাবন্তীকে দেখলে আমার মন খুশির জোয়ারে নেচে উঠতো। শরীরে এক অজানা হিল্লোল খেলা করতো। আমি স্থির পলকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। চোখের স্কেলে তাকে পরিমাপ করতাম। অদ্ভুত অনুভূতি জাগতো। তার মুখের দিকে তাকালে তীব্র আকর্ষণ টানতো। দেহসৌষ্ঠব তো অসাধারণ! মাঝে মাঝে বুকের দিকে তাকালে অন্য এক আদিম দুনিয়ায় চলে যেতাম।

বিয়ের পরেও শ্রাবন্তীকে আমার খারাপ লাগতো না। যখন ওর প্রথম স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটে গেলো তখন আমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল- আমার জন্যে তার এই বিচ্ছেদ ঘটেছে। আমি যখন বিয়ে করে ঘর সংসারী হয়ে গেলাম তখন শ্রাবন্তীর আবার বিয়ে হলো। আবার আমার মন খারাপ। তারপর সেই বিয়েটাও যখন ভেঙে গেল, আমি পুনরায় মনে মনে চাঙা হয়ে উঠলাম। জানতাম শ্রাবন্তীর সন্তান আছে। তবুও আমার স্বপ্নে গড়বড় ঘটেনি। আমি চান্স পেলে শ্রাবন্তীর হাত ধরতাম। না, এই হাতধরা মানে তাকে উদ্ধার করা নয়। আমি তেমন মহাপুরুষ নই। শক্তি কাপুরের মতোও বদমায়েশীর উদ্দেশ্য নেই। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্যই হাত ধরা।

শ্রাবন্তীর ফের বিয়ে হলো। আমি দেখতে থাকলাম। আবার আফসোসের সাগরে ডুবলাম। করার কিছু নেই। স্বপ্ন দেখা যায় বটে, চাইলেই কাউকে বিয়ে করা যায় না। তবে শ্রাবন্তীকে বিয়ে করা যাবে না, এটা আমি মানতে পারতাম না। আমার সামনেই তিন তিনবার তিনজন পুরুষ তাকে বিয়ে করেছে।আমিও পুরুষ। চতুর্থ চান্স থাকতেই পারে। আমার শখ আহ্লাদ পূরণ হতে পারে। শ্রাবন্তী এখন আর অধরা আকাশের তারা নয়। আমি না ধরি, তাকে আর তিনজন ঘটা করে ধরেছে। যতদিন যাচ্ছে- বিয়ের বাজারে তার কদর কমছে। কিন্তু রূপের ঝলক আর শরীরী চমক কমেনি। বরং বাড়ছে।

শ্রাবন্তীর তৃতীয় বিয়েও ভাঙলো। আমার স্বপ্নও জিন্দা। আমি তার শরীরের দিকে ভাল করে তাকাই। তেমন কোন অদল বদল নেই। হয়তো শরীরের পসরা বেড়েছে কিন্তু যৌবনের ঝলকানি যেইসেই থেকেই গেছে। দেখলে মনেই হয় না- তিন তিনটা বাসর শয্যার দখল ওই গতরের উপর দিয়ে গেছে। শুধু কী বাসর? মাস-বছরও তো কেটেছে। হিসেব করলে অনেক কিছু। অনেক গুঢ় ব্যাপার। পুরুষ মানুষ সুন্দরী ললনা বিয়ে করে জবুথবু হয়ে ব্রহ্মচারী জীবন কাটাবে, এটা মানা যায় না। আর মানবার কথাও নয়। বিয়েতে অনেক খরচা হয়, তাও যদি উশুল করতে না পারে তবে বিয়েরই বা কী দরকার! কিন্তু শ্রাবন্তীকে দেখে ওসব ঠাহর করা যায় না।

আমি মাঝে মাঝে অনুমানের চেষ্টা করতাম। তার অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করে মনে মনে হাসতাম। ইসলামে পুরুষের চার বিয়ের সম্মতি আছে। ভিন্ন ধর্মের নারী হয়েও শ্রাবন্তী সে সুযোগটা নিতে চলেছে। তবুও তাকে ভাল লাগে। যে মেয়ে তিন পুরুষের সামনে কোন না কোনভাবে সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়েছে, যাকে তিন জন পুরুষ রাতের পর রাত একান্তে পেয়েছে, তারা তো আর ধ্যানরত ঋষি-মুনি ছিল না। যাকে দেখলে ধ্যান ভাঙতে বাধ্য, তার সাথে কতটা কী ঘটেছে বোঝার সাধ্য আছে? হোক সে যা থা, এখনও তো সে উর্বশী রাওঠেলা মার্কা অপ্সরা। আমার শখ স্বপ্নও পুরো কড়কড়া।

আমি চিন্তা করি- কেন বারবার শ্রাবন্তীর বিয়ে ভাঙে? একবার ভুল সমন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাই বলে পরে আরও তিনবার? কী সমস্যা তার! কেন ঠিকঠাক ফিটফাট হয় না। মতের অমিল, নাকি অন্যকিছু? মত নাইবা মিললো, কিন্তু তিন পুরুষ তো আর বেদুরুস্ত হতে পারে না। তারা কী এমন শরীরের সাথেও বনিবনা করে সংসার চালাতে পারলো না! আমার দৃষ্টিতে অবশ্য শ্রাবন্তীর স্ট্রাকচারে কোন ত্রুটি ধরা পড়ে না। আর চার পুরুষ নিকম্মা একথাও মেনে নেওয়া যায় না। তিনজনের বিজ্বালা একই ধরণের হবার কথা নয়। ধুর বা, আমি সেই হিস্ট্রি রিসার্চ করবো কেন! ওসব শ্রাবন্তীর ব্যাপার। সে জানে, কার গণ্ডগোল কোনখানে।

আমি শুধু তাকে দেখি। মনে মনে ভাবি- এই তিনজনের একজন যদি আমি হতাম! কতটা কী করতাম তার নীলনক্সা তৈরি করি। হয় না, তা আর হয় না। স্বপ্ন আর বাস্তবের সেই তফাত থেকে যায়। তবে চতুর্থ সুযোগটা কার বরাতে- সেকথা ভাবতে ভাবতেই আমার রাত কাটে। আর শ্রাবন্তী বিয়ে করে। বিচ্ছেদ হয়। আমার বদ-দোয়াতেই বোধহয়। কিন্তু কেন সেটা আমার সাথে হয় না, এই প্রশ্ন কতভাবে ঘুরপাক খায় মগজে। স্বপ্ন নড়ে। স্বপ্ন ফরফর করে উড়ে। শ্রাবন্তী থিতু হয় না। আমার ইচ্ছেও দমে না।

দেখতে দেখতে আমিও আধবুড়ো। অথচ শ্রাবন্তীর কী দারুণ বডি ফিটনেস! এখনও টাটকা লাগে তাকে দেখতে। গায়ে গতরে কী যে জৌলুস! মাখন মসৃণ নিখাদ পেলবতা। তার উপর শরীরী শীহরণের বাধভাঙা উছ্বাস! উফ্! যে সুখ অনেক কুমারী মেয়ে দেখেও হয় না। আমার স্বপ্ন দেখা গলদ নয়। গলদ এটুকুই- আমি কোনও সেলিব্রিটি হতে পারলাম না। বেকার লেখালেখি করি। শ্রাবন্তী কোথাও ফিক্সড হয়ে গেলে আমি নবেল পেলেও কোনও ভেল্যুউ থাকবে না। শ্রাবন্তীর চতুর্থ আয়োজনেও আমার এন্ট্রি নিশ্চিত নয়। বাঘ বুড়ো হলেও খাপ বুড়ো হয় না ঠিক। তবে আঙুল চোষা ছাড়া আমার স্বপ্নের এখনো কোন সার্থকতা নেই। আর এই স্বপ্নের সাথে বাস্তবতারও কোন মিল নেই।

মোবাইলের এপর্যন্ত নিজের লেখা ঠিকঠাক দেখে নিয়ে ব্যাগ পত্তর গুছিয়ে হোটেল থেকে বের হলাম। প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসার

জায়গা হলো না। ঘড়ি দেখে ক্ষনিকের জন্য একটা খুটিতে হেলান দিয়ে বসলাম। ট্রেন কতদূরে আমার জানা নেই। মোবাইলে সেই এ্যাপসটাও নেই যে খুঁজে দেখবো- রঙিয়া এক্সপ্রেস লেটে আসছে কিনা। এরই মাঝে হোজাই প্ল্যাটফর্মে ঘন ঘন লোডশেডিং চলছে। তবুও ডিসপ্লে বোর্ডে হিন্দী-ইংরেজি হরফে ট্রেনের গতিবিধি এবং সময় ভাসছে। আমার অদূরে বসে দুজন অবাঙালি গল্প করছেন। তাদের পেছনে একজন মেয়ে। সম্ভবত সে একা। অন্তত তার দূরত্ব বজায় রেখে সরে বসার নমুনা প্রমাণ করছে এ যাত্রায় কারোর সাথে তার সম্পৃক্ততা নেই। আমি অবাঙালি দুজনকে লক্ষ্য করে জানতে চাইলাম তারা ঠিক কোন ট্রেনের অপেক্ষা করছে? উত্তর শুনে বুঝলাম তারা অন্য ট্রেনের যাত্রী। পেছন থেকে মেয়েটি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। কিন্তু কোনও কথা বললো না। ততক্ষণে আরও দুই যাত্রী আমার বাঁদিকে এসে বসলো। ওরা বাঙালি।একজন অপরজনকে বলছে- আর যাইহোক, টিটি ভালো ছিল। না হলে আমাদের এখানে না নামিয়ে অনেক টাকা জরিমানা করতে পারতো। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাদের লক্ষ্য করলাম। বাঙালি গতিকে সহজ স্বাভাবিক স্বরে প্রশ্ন করলাম- কোথায় যাবেন? তারা 'বদরপুর' শব্দটা উচ্চারণ করে নিজেদের মধ্যে কথা শুরু করলো। বোঝা গেল- মাঝখানে হঠাৎ প্রশ্ন করায় তাদের কথাবার্তায় বিঘ্ন ঘটেছে। বুঝেও আমি ফের প্রশ্ন করলাম- আপনারা বিনা টিকিটে উঠেছিলেন!কোথা থেকে? মনে হয়েছিল ওরা আরও বিরক্ত হবে। কিন্তু না, সহজ ভাবে একজন উত্তর দিলো- কলকাতা থেকে। বললাম- কোন ট্রেনে যাবেন? আমার কথায় এদের একজন পকেট থেকে টিকিট বের করে দেখে বললো- রঙিয়া এক্সপ্রেস। এখান থেকেই জেনারেল টিকিট কেটেছি। দাড়িয়ে যেতে হবে, তবুও রক্ষে। নামিয়ে দিতে পারবে না। এই নিয়ম আমার জানা ছিল না। ট্রেন জার্নিতে একটা সাধারণ টিকিট খুব জরুরি। সিট না পেয়ে যেকোন কামরায় ওঠে পড়লেও হয়। জরিমানা আটকানো যায়।

মেয়েটা আড়চোখে আমাকে লক্ষ্য করছে। হয়তো আমার কথা খেয়াল করছে। সে নীরবে বসে মোবাইল দেখছে। আমি একবার উঠে গিয়ে পাশের দোকান থেকে জলের বোতল কিনলাম। দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম- রঙিয়ার দেরির কারণ কী। সে সদুত্তর দিতে পারলো না। ফেরার সময় মেয়েটাকে দেখলাম। সে মাথা নুইয়ে মোবাইলে চোখ গেঁথে রয়েছে। তার মোবাইলে খবর চলছে। রীনা ভাবীকে আদালতে তোলা হয়েছে। আটক হয়েছে রীনার বাবা-মা এবং প্রেমিক। আমি আবার জায়গায় এসে বসলাম। নেট দুনিয়া উত্তাল রীনা ভাবির কাণ্ডে। ঘরে ঘরে সবার মুখে এই ঘটনার চর্চা। যে যাকে পারছে বলছে। কলাই ডাল খেতে নিষেধ করছে। কী

সাজ্ঘাতিক পরকিয়ার কাণ্ড। রীনা ভাবীর স্বামীর লাশ বারো দিন পর কবর থেকে তুলে ময়না তদন্তে গেছে। খবর রটেছে খাদ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় গাড়ি চালক রীনার অন্তরঙ্গ প্রেমিকের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সে সম্পর্কের স্বীকারোক্তিও দিয়েছে। রীনা ভাবী অস্বীকার করছে। জনতা মানছে না। মামলা এখন আদালতে। দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করছে মানুষ। এসব খবর নিয়েই এখন ফেসবুক ছয়লাপ। মেয়েটাও মনোযোগ দিয়ে মোবাইলে দেখছে।

একটু পরেই পাশের বাঙালি দুজন চলে গেল। আমি চোখে চোখে তাদের খুঁজতে লাগলাম। ওরা পাশে থাকলে হয়তো কিছুটা সুবিধা হতো। ট্রেন কতদূর অব্দি এসেছে তাদের কাছ থেকে জানতে পারতাম। সুযোগটা হারিয়ে গেল। দুজন অচিনাকি মানুষ প্ল্যাটফর্মের ওদিক থেকে হেঁটে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে- ট্রেন আরও চৌত্রিশ মিনিট লেট। আমি তাদের উদ্দেশ্য প্রশ্ন করলাম- রঙিয়া নাকি? বেশ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওরা কোনকিছু না বলেই হাঁটতে থাকলো।মিঞা মানুষকে খারাপ না পাবার উপায় আছে? আমি অবাঙালি দুই যাত্রীর দিকে তাকালাম। তারা আরামে মোবাইল ঘাটছে। আমি বাদ যাবো কেন? ট্রেন যখন আসবে, দেখা যাবে। যেকোন একটা বগীতে উঠতে পারলেই হলো।

স্টেশনে বসে বসে আছি। একের পর এক ট্রেনের ঘোষণা হচ্ছে। ট্রেন আসছে, চলে যাচ্ছে। রঙিয়া আসেনি। আধঘন্টার বেশি সময় পার হয়ে গেছে। ভাবছি- কী যে হবে! ট্রেন যদি আরও দেরি করে বা কোন কারণে মিস হয়ে যায় তাহলে স্টেশনেই রাত কাটাতে হবে। এখন যে সময়, হোটেলে ফিরে রুম পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, হোজাইর যা অবস্থা! খুব বেশি হোটেল নেই। যেগুলো আছে তন্মধ্যে দু-একটা ছাড়া তেমন সুবিধার একটাও নেই। আগে আরও কয়েকবার হোজাইতে এসেছি। পাহাড় লাইনে ট্রেন যাত্রা নিরাপদ নয়। হাফলংয়ে ধস পড়ে। ট্রেন আচমকা আটকা পড়ে বা বাতিল হয়ে যায়। দুর্গতির সীমা নেই। তাছাড়া হাইলাকান্দি থেকে দূরপাল্লার কোন ট্রেন নেই। রাত বিরেতে গাড়ি নিয়ে বদরপুর এসে ট্রেন ধরতে হয়। কোন কোন সময় রাস্তার যানজটে ট্রেন ধরা যায় না। আশার কথা, এবছর মিজোরামের সাইরং থেকে দেশের অন্য প্রান্তের সাথে রেল যোগাযোগ শুরু হবে। হাইলাকান্দির মানুষের দুর্ভোগ লাঘব হবে। এই কিছুদিন আগে ধসের কারণে ট্রেন পরিষেবা না থাকায় শিলচর হাফলং হয়ে বহু কষ্ট করে গাড়ি নিয়ে রাত একটায় হোজাই এসে পৌঁছে ছিলাম আমরা তিনজন। সারারাত এদিক সেদিক ঘুরেছি। ডেকে ডেকে হোটেল কর্মীদের ঘুম ভাঙিয়ে রুম খুঁজেছি। কী কষ্ট! কোথাও কোন হোটেলের রুম খালি পাইনি। তিনজন মানুষ গুগলে হোটেল লোকেশন খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। ফোনের পর ফোন। কোথাও গা হেলানোর জায়গা নেই। সব

বুকড। এমনিতেই হোজাইতে ব্যবসায়ীদের নিত্য আনাগোনা। আগরের প্রাণকেন্দ্র নীল বাগান। আজমলের সুপার ফর্টিসহ আরও বিবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। লোক সমাগম চলতেই থাকে। হোটেলে সঙ্কুলান হয় না। স্কুল কলেজে, হোস্টেলে থাকা ছেলে মেয়েকে দেখতে যখন অভিভাবকেরা যায় তখনি হোটেলের অপ্রতুলতা ধরা পড়ে। আমরাও তার শিকার হলাম। শেষমেষ পনেরো বিশ কিলোমিটার দূরের লঙ্কা থেকে এক হোটেল কর্মী যোগাযোগ করে রুম দিতে পারবে জানালো। ততক্ষণে রাত তিনটার কাছাকাছি। দীর্ঘ সফরের ধকল শরীর আর সইছে না। এতদূরে যাওয়া যায় না। একজন গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ঘুম নেই। রাত পোহালেই বাঁচি। চা টা খেয়ে হোস্টেলে চলে যাবো। মেয়েকে দেখে কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞেস করে বিদায় নেবো। কিন্তু বাকি দুজনকে তো ঘুমোতেই হবে। সারা পথ গাড়ি চালিয়েছে। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম না নিলে কী হয়? আবার যে ফিরতে হবে। গাড়িতে উঠে দেখা গেল- চালক বেচারা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কোথা থেকে যে গাড়িতে মশা ঢুকেছে বোঝা গেলো না। আমরা গাড়িতে ওঠেই মশার উপদ্রব টের পেয়ে নেমে পড়লাম। হোজাইকে গালমন্দ করে মনের ঝাল মেটালাম। গাড়ি ওভার ব্রিজের নিচে পার্ক করা ছিল। ঘুমিয়ে পড়া মানুষটাকে জাগাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে বেঘোর ঘুমেই। মশার ঈদ চলছে তবুও জাগতে চাইছে না। গাড়িতে জল ছিল। হাত-মুখ ধুয়ে আমরা একটু হাঁটাহাঁটি করলাম। তখনও ভাবছি কোথাও থাকার বন্দোবস্ত হয়ে যেতে পারে। না, তা আর হয়নি। যেভাবেই হোক রাত কাটাতে হবে। পাতলা বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডা আবহাওয়া। মাথা গরম। নিন্দামন্দে দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলো। মসজিদে আজান হয়েছে। হাল্কা শীত শীত লাগছে। মানুষের হাঁকডাক শুরু হয়েছে। উপায়ন্তর না হওয়ায় মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। দুজনে বারান্দার ফ্লোরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন প্রায় পৌনে আটটা। মুখ হাত ধুয়ে বের হলাম। হোজাইতে সে রাতের বিড়ম্বনার কথা এখনও দগদগ করছে। এদিকে ট্রেনের টিকিট কনফার্ম হয়নি। আজ যে কী দুর্গতি হয় কে জানে! এখান থেকে ওঠে গিয়ে ফাঁকা একটা জায়গায় বসলাম। স্টেশনে মানুষের আসা যাওয়া দেখছি। একাকী মেয়েটা আমার দিকে এগিয়ে এসেছে। আমি ভ্রুক্ষেপ করিনি। হোয়াটসঅ্যাপে ছিলাম। মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে কী যেন বললো। মুখ তুলে তাকালাম। সে আবার বললো- ভুল প্ল্যাটফর্মে আছেন। প্ল্যাটফর্ম টু-তে রঙিয়া থামবে। আমি কোনও ঘোষণা শুনিনি। অচেনা মেয়েটা যেচে এসে এই নোটিশ দিলো কেন? সত্যি কী তাই। চোখতুলে ডিসপ্লে বক্সে তাকালাম। হ্যাঁ, ঘোষণা জারী হয়েছে- রঙিয়া শিলচর এক্সপ্রেস কুছি দের মে প্ল্যাটফর্ম টু পর আ রহি হ্যায়। উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটা উড়ালপুলের দিকে যাচ্ছে। আমি তার পেছনে। দু-নম্বর প্ল্যাটফর্মে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দাঁড়ালাম। মেয়েটা আমার থেকে অনেক দূরে। মনে মনে প্রশ্ন রাখলাম- আজকের দিনে কোনও মানুষ যেচে এমন উপকার করে?

ট্রেনে উঠেছি। টিকিট নেই। নেই মানে এসি টু টায়ারে ওয়েটিং ওয়ান ছিল, কনফার্ম হয়নি। কিছুটা ভয়ভীতি কাজ করছে মনে। জরিমানা হতে পারে। কিন্তু উপায় নেই। আমাকে ফিরতে হবেই। তিনদিন ছুটি নিয়ে ফেলেছি। এক্সটেনশন করতে পারবো না। এখন এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছি, সময় মতো পৌঁছাতে পারবো কিনা জানি না। ট্রেন এসেছে কিন্তু দেড় একঘন্টা লেট। পাহাড় লাইনে সমস্যা হয়। সহসা ধস পড়ে। সারাই চলে। ট্রেন বিলম্বিত হয়। আসা যাওয়া মর্জিমাফিক নয়। ঝুঁকি থাকেই। হোজাই স্টেশনে ট্রেন স্বল্প সময়ের জন্য থামে। এরমধ্যে তড়িঘড়ি উঠতে হয়। আমি নিয়মিত যাত্রী নই। কিন্তু এই কদিনে কয়েকবার হোজাই যাওয়া আসা হয়ে গেছে। আরও হবে। সঙ্গে একটা ব্যাগ আছে। তাতে তেমন কিছু নেই। গামছা আর একজোড়া শার্টপ্যান্ট। এগুলি তেমন দামের নয়। তবে মোবাইলের চার্জারটা মূল্যবান। ওটার জন্যেই ব্যাগটাকে নজরে রাখি। নতুবা আরকি। সফরে যত সরঞ্জাম থাকে ততো ভোগান্তি ঘটে। অভিজ্ঞতা আছে। একটা জলের বোতল হাতে নিয়ে ট্রেনে উঠেছি। জানি বার্থ পাবো না। খালি থাকলে আমার ওয়েটিংয়ের টিকিটখানা কনফার্ম হয়ে যেত।

ভালো করে দেখে বি-ওয়ান কোচে উঠেছি। টিটির সঙ্গে দেখা করবো। বিপদে না পড়ার ধান্ধা। টিটির দেখা নেই। ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে এ-ওয়ান কামরায় চলে গেছি। একজন টিটির দেখা পেলাম। মোবাইলে তাকে টিকিট দেখিয়ে বুঝিয়ে বললাম- যেখানেই হোক, আমাকে একটা সিটের ব্যবস্থা করে দিতে। তিনি আমার দিকে তাকালেন। তারপর আমার মোবাইল হাতে নিয়ে টিকিট জুম করে দেখে বললেন- কনফার্ম হয়নি, করার কিছু নেই। আপনি বি-ওয়ানের লম্বা টিটির সাথে যোগাযোগ করুন। এ-ওয়ানে খালি নেই।

উল্টো হাঁটা দিলাম। মনে মনে ভাবলাম সারারাত কষ্ট করেই যেতে হবে। ভাগ্যে যা আছে। ঘরে পৌঁছালেই হলো। ট্রেন চলছে। ঘরের সাথে ফোনে যোগাযোগ হয়েছে। সিট পাচ্ছি কিনা এনিয়ে তারাও উদ্বিগ্নে রয়েছে। সত্যি বলতে আমি ততটা দুশ্চিন্তায় নেই। জানি, টাকায় বহুকিছু হয়। হতে পারে। আপাতত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

দু-কামরার মাঝখানে আরও দু-একজন যাত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। এরা বোধহয় এভাবেই যাতায়াত করে। তাদের কোনও হেলদোল নেই। তারা টিটির সঙ্গেও কথা বলছে না। বরং সাফাই কর্মীদের সাথে গল্প করে দিব্যি আরামে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন সাফাই কর্মী কাছে এসে বললো- সিট নেই! টিটির সঙ্গে দেখা করেছিলেন? আমি মাথা নেড়ে বললাম- না। বি-ওয়ানের টিটিকে পাইনি। সে বললো- এদিকে গিয়েই পরের কামরায় পেয়ে যাবেন। যাবো কিনা ইতস্ততঃ করছি। মনে মনে সেই মেয়েটাকেও খুঁজছি। যদি আবার দেখা হয়। মেয়েটা তো মন্দ নয়। তখনি একটা সমস্যার কথা মনে পড়লো।

এক ভদ্রলোক দেড় বছরেও গাড়ির পারমিট সংগ্রহ করতে পারেননি। পরে পরিবহনের এক কর্মী তাকে একদিনের মধ্যেই পারমিট তৈরি করে দিয়েছে। আমিও সেই ফর্মূলায় চেষ্টা করতে পারি। ট্রেনের সাফাই কর্মীর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

যা ভেবেছিলাম তাই। পারমিটের গল্পের মতোই। তার আগে পারমিটের গল্পটা বলে নিই। কার কী ক্ষমতা এবং সিস্টেম কী জিনিস বোঝা যাবে। যে ভদ্রলোক গাড়ির পারমিটের জন্য দেড় বছরের মধ্যে পঁচিশ ত্রিশবার দৌড়ঝাঁপ করেছেন, হোটেল ম্যানেজারসহ গুয়াহাটির প্রায় মানুষের সাথে চেনা-জানা হয়ে গেছে কিন্তু গাড়ির পারমিট জুটেনি তার। সেটা অবশ্য মিটার গেজ আমলের কথা। তখনকার দিনে গুয়াহাটি থেকে পারমিট নিতে হতো। তিনি কাবু করতে পারেননি। হতাশ হয়ে অফিস থেকে ঘটাং করে দরজা ঠেলে শেষবারের মতো বেরিয়ে পড়েন। দৃশ্যটা চৌকিদারের নজরে পড়ে। সে তাকে ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করে- 'কী হয়েছে মশাই? বহুদিন থেকেই দেখছি, আপনি হাসিমুখে স্যারের রুমে ঢুকেন আর মুখ গুমোট করে বেরিয়ে যান। ব্যাপার কী বলবেন তো!' তিনি কিছুটা রাগত স্বরে বললেন- 'কী আর বলবো! হোটেল আর গাড়ি ভাড়া মিলে দশ-বারো পারমিটের টাকা খরচ করে ফেলেছি। কিন্তু আজ এই, কাল সেই কাগজ চেয়ে তোমার স্যার আমাকে কলুর বলদের মতো হয়রানি করে চলেছেন। দিতে পারবেন না বা দেবেন না, সাফ বলে দিলেই পারতেন!' চৌকিদার তিরতির করে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে গলায় জোর তুলে বললো- 'আরে মশাই! পারমিট কি স্যার দেয়! নাকি স্যারের বাবা দিতে পারে? পারমিট আমি দিই! বেচারা সাধাসিধে। অবাক হয়ে চৌকিদারের মুখপানে তাকালেন। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলেন না। চৌকিদার তার কানের কাছে মুখ এনে বললো- রাগ করছেন কেন? দিন দশ হাজার টাকা। পরশু এসে পারমিট নিয়ে যাবেন। কোন হেরফের হবে না। আমি কথা দিলাম।' ভদ্রলোক তখনও ধোঁয়াশায়। বললেন- আজও আমাকে গুয়াহাটি থাকতে হবে। হোটেল ভাড়া গুণতে হবে। তারপর পরশু এসে শুনবো - এটা দিইনি, সেটা হয়নি! চৌকিদার তার কায়দায় বুঝিয়ে বললো- আহারে মশাই, সে চিন্তা আমার। আপনার পারমিট পেলেই হলো তো! আম খান, গাছ দেখতে যাবেন না। ভদ্রলোক শুনলেন। বলা ভালো- চৌকিদারের কথায় বশীভূত হয়ে গেলেন। বিশ্বাস করে টাকাও দিয়ে দিলেন। না, আর দেরি হয়নি। কথামতোই পারমিট হস্তগত হয়ে গেল। যারা কাজকরে এবং কাজের জন্য বরাত নেয় তারা খুব একটা বেইমানি করে না। এভাবেই অফিস আদালতে প্রতিনিয়ত প্রচুর মানুষ সিস্টেমে গড়াগড়ি খায়। কাজ হয় না। বগলে দা রেখে এদিকে সেদিকে ঘুরে। ভুল জায়গায় অনুনয় করে। টাকা উড়ায়। মধুলোভী ভ্রমর চেনে না। পথও পায় না।

অদূর থেকে ট্রেনের সাফাই কর্মী আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সহকর্মীর সাথে ফিসফিস করছে। ভাবছে বোধহয় একটা সলিড ভুক্তভোগী পাওয়া গেছে। আমি তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম- একটা সিটের ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে? একজন বললো- তো দেরি করছেন কেন? পরে নাও পেতে পারেন। আমিও কাল বিলম্ব করতে রাজী নই। বললাম- সিট আছে নাকি! কোথায়? সাফাই কর্মী আমাকে সঙ্গে নিয়ে বি-টু কোচে গেলো। বি-টু থেকে থ্রি'র দিকে। না, কোথাও সিট খালি নেই। নেই উপকারী সেই মেয়েটাও। কোন কামরায় উঠেছে কে জানে! পাত্তা নেই। রেলকর্মী এবার ওই কোচের সহকর্মীর সাথে কথা বললো। তারপর আমাকে এসে বললো- একটা হতে পারে। খানিক আশা জাগলো। সে আমাকে নিয়ে সাইড লোয়ার বার্থ দেখালো। জিজ্ঞেস করলো- চলবে? চলবে মানে! আমার যেকোন একটা হলেই হয়। খুশি হলাম। সে আমার জন্য বেশ খোঁজাখুজি করেছে। সিটে ব্যাগ রেখে বসে পড়লাম। তারপর সাফাই কর্মীকে প্রশ্ন করলাম- কত দিতে হবে? বললো- ছয়শো টাকা। আমি দর কষাকষি করলাম না। শুধু বললাম- টিটিকে আবার কিছু দিতে হবে না তো? সে হেসে বললো- না, না। টিটিকে আবার দেবেন কেন?

ঠিক আছে। আপদ মুক্ত তবে।

ট্রেনে প্রায় সময় দেখা যায় বিনা টিকিটের যাত্রীরা থাকে। টিটি টিকিট চাইলেই এই সেই কৈফিয়ত দেয়। বাক বিতণ্ডা বাধে। জরিমানা হয়। আমার তেমন কিছু না হলেই ভালো। কিছুক্ষণ পরে সেই মেয়েটা এসে আমার সিটে ধপাস করে বসলো। আমি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। হয়তো আমার মতো তারও টিকিট কনফার্ম হয়নি বা হতে পারে অন্যকিছু। ততক্ষণে একজন টিটি বি-থ্রিতে টিকিট দেখতে এসেছেন। মনে হচ্ছে আমার কাছে এসেও টিকিট দেখতে চাইবেন। হোয়াটস্অ্যাপে ওয়েটিংয়ের টিকিট বের করে রাখলাম। কাছে এসে দেখতে চাইলে দেখাবো। ভাগ্যিস, আমার নিকট অবধি আসতে হয়নি তাকে। তার আগেই ধরা পড়ে গেলো একজন। কী হয় দেখি। কথাবার্তা চলছে। টিকিটের বিসংগতিতে যে ব্যক্তি ধরা পড়েছে, তার চেহারা বেশ মোটাসোটা। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ হবে। টিটির মতো লম্বাকৃতির। সেও মোবাইলে ব্যস্ত ছিল। টিটির সাড়া পেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। টিটি যখন তাকে ডেকে বললেন- এই যে শুনছেন, টিকিট দেখান। তার চোখ খুলছে না। তিন চারবার ডাকার পরেও সাড়া নেই। টিটি গায়ে টোকা দিলেন। উঁহু, একটু নড়তে দেখা গেলো। টিটি বললেন- সত্যিই ঘুমোচ্ছেন তো? জবাব নেই। নিরুপায় হয়ে টিটি তাকে সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন। একটু কাত হয়ে চোখ মেলে দেখলো। টিটির সাথে দৃষ্টি বিনিময় হতেই মেজাজ হারিয়ে ফেললো। প্রশ্ন ছুঁড়লো- কী হয়েছে মশাই? এতো ডাকাডাকির কারণ কী? বউও আমাকে এতবার ঝাঁকায় না। বসবেন তো বসুন। অন্যদিকেও সিট আছে,দেখতে পারেন। টিটি ক্ষেপে উঠলেন- আরে দাদা, আমি বসবো না। আপনার টিকিটটা দেখান। লোকটা গভীর ভাবে টিটিকে নিরীক্ষণ করে একবার বাম পকেটে আর একবার ডান পকেটে হাত দিয়ে এমনভাবে মুখ করলো যেন সাতরাজার ধন হারিয়ে ফেলেছে। পরে

শার্টের পকেটেও হাত দিয়েছে। সেখানেও মেলেনি। থাকলে অবশ্যই মিলতো। এবার মিনতির সুরে বললো- মনে হয় টিকিটটা হারিয়ে গেছে। টিটি প্রশ্ন করলেন- কোথায় যাবেন আপনি? একবাক্যে উত্তর দিলো- কাটাখাল। টিটির কথা- ওকে। পনেরো'শ পঞ্চাশ টাকা বের করুন।

লোকটি চোখ বড়ো বড়ো করে তাকালো। খ্যাক খ্যাক করে হেসে বললো- কি বলেন! পনেরো'শো পঞ্চাশ? মনে হচ্ছে টাকা গাছে ধরে। বললেই হয়ে গেল? আমি টিকিট কেটেছি। হারিয়ে গেছে কী করবো? টিটি যেন কথা বাড়াতে চাইলেন না। বললেন- অত কথা বুঝি না। টাকা বের করুন। এমন আবদার অনেকেই করে। লোকটা গলা হেঁকে কেশে নিয়ে বললো- তারমানে আমি মিথ্যে বলছি ? টিটির টাটকা জবাব- মনে তো হচ্ছে তাই। এবার সে কিছুটা উঠে বসলো। মোকাবিলা শুরু। সবাই যেন নাটক দেখছে। টিটিকে বললো- আপনি যে এই ট্রেনের টিটি প্রমাণ করতে পারবেন? টিটি গলায় ঝোলানো পরিচয়পত্রটি এগিয়ে ধরে বললেন- এই যে! পড়তে পারেন, পড়ে দেখুন। দুজনের কথার ছিরিই আলাদা। পাশের মেয়েটি আমার দিকে তাকালো। আমি তারদিকে! আমার তবে কী হবে? লোকটা অট্টহাসির মতো হাসলো। তারপর বললো- ওটা আসল না নকল আমি কি করে বুঝবো? দেশে কী নকল টিটি, নকল ডাক্তার, নকল সিবিআই অফিসারের অভাব রয়েছে? এই তো কয়েকদিন আগে নারী শিক্ষাশ্রম থেকে ভুয়ো ডাক্তার ধরা পড়েছে। যে কিনা মেট্রিক পাশ নয়, তবুও গায়নোকোলজিস্ট সেজে অস্ত্রোপচার করেছে। পরে আরও কয়েকজন। আমি তবে কোন বিশ্বাসে আপনাকে ফাইন দেবো। এরকম কার্ড আমারও আছে। আমি পলিটিক্যাল পার্টির মানুষ। মণ্ডল কমিটির কর্মকর্তা। দয়াকরে আমাকে ক্ষ্যাপাবেন না।

ততক্ষণে আর একজন টিটি ওর কাছে এসেছেন। ভাবখানা দেখে তিনি সহকর্মী টিটিকে পরামর্শ দিলেন- আর.পি. এফ ডাকুন। টাকা দিতে বাধ্য হবে। লোকটা সহজ না। সমানে সমানে বলে উঠলো- আরপিএফ! আমার পার্টিরও অনেক লোক আছে। আমি তাদের ডাকবো। পরে সামাল দিতে পারবেন তো?

ভেবেছিলাম আরাম করে বসে শ্রাবন্তীর গল্পটা শেষ করবো। এখন যা পরিস্থিতি! এই বগী রণে উঠেছে। পাশের মেয়েটাকে দেখছি। সেও এই ঝামেলায় বিব্রত বোধ করছে। উফ্! বগীর সুন্দর পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছে লোকটা।

এদিকে টিটি আর.পি.এফ'কে কল করতে শুরু করেছেন। প্রয়াস সফল নাকি কল সংযোগ হয়নি বুঝতে পারলাম না। টিটি ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন- আপনাকে লামডিংয়ে নেমে যেতে হবে। যা বলার অফিসে গিয়ে বলবেন। লোকটা বললো- কেন আমি নামবো? টিটি মুখটান করে বললেন- নামতে আপনাকে হবেই। না নামলে জোর করে নামানো হবে। লোকটা খুব হাসলো। হাসতে হাসতে বললো- ঠিক আছে, দেখি কার কতো ক্ষমতা। কে কাকে নামায়!

দেখলাম সামনের মেয়েটা হাসছে। হাসার কথা। লোকটা দারুণ পাঙ্গা নিয়েছে। টিটি দুজনকেই অসহায় করে ছেড়েছে। বাকিরাও মজা নিয়েছে। ইতোমধ্যে পাশের সিটের এক বয়স্ক ভদ্রলোক মুখ খুললেন। টিটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন- আরে! কী নিয়ে যে পড়লেন। ছেড়ে দিন না। একজন প্যাসেঞ্জার ফ্রীতে চলে গেলেই বা কী। টিটি রেগে গেলেন। বললেন- আপনার দরদ বেশি। ঠিক আছে, ভাড়াটা আপনি মিটিয়ে দিন। এটা মামার গাড়ি নয় যে, কেউ মাগনা যাবে। মাঝখানে তদ্বির করে বেচারা ফেঁসে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন- আমি? আমি কেন দেবো! আপনি যখন ছাড়বেন না আর ও যখন দেবে না তখন আমরাও দেখি কার কতোটা ক্ষমতা। খামাকা আমার উপর ঝাল মিটাচ্ছেন। এতক্ষণ থেকে নামাতে পারছেন না কেন?

ততক্ষণে ট্রেন লামডিং স্টেশনে এসে থেমেছে। এখানে একটু বেশি সময় নেয়। আশাকরা যায় কিছু একটা ঘটবে। দুজন টিটি নেমে পড়লেন। আরও কয়েকজন নামলো। ফেরিওয়ালা ওঠে চানা-বাদাম বিক্রির ধান্ধা করতে লাগলো। আমি বোতল থেকে জলপান করলাম। মেয়েটা আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর মৃদুস্বরে বললো- অবশেষে আপনি আমি এখানে! একই সিটে। আমি বললাম- হ্যাঁ, তবে আমি কিন্তু আগে এসেছি। সে মানতে চাইলো না। বললো- আমি টয়লেটে গেলাম বলেই আপনার আগে আসা হয়ে গেল! দখলদারি দেখাচ্ছেন বুঝি?

আমি আর কিছু বললাম না। এই আধখানা সিটের জন্য ছয়'শো টাকা দিলাম! যাক, ব্যবস্থা খারাপ নয়। এমনি এক ব্যক্তি তার মাকে খুঁজতে খুঁজতে হন্যি হয়ে আমাদের মাঝখানে এলো। ঘটনা কী ঠিক বোঝা গেল না। অন্যদের কথাবার্তা থেকে জানতে পারলাম- ওই ব্যক্তির মা খোয়া গেছেন। কামরা জুড়ে খোঁজ পড়লো। কোথাও নেই। তাজ্জব ব্যাপার। চানা-বাদাম বিক্রেতা সাক্ষ্য দিচ্ছে- ট্রেনে ওঠে সে ওই মহিলাকে সিটে শুয়ে থাকতে দেখেছে। তাহলে মিনিট দুয়েকের মধ্যে কোথায় গেলেন তিনি? খোঁজ চলছে পুরোদমে। আমার পাশের মেয়েটি বললো- একটু আগে সে তাকে ওদিকে যেতে দেখেছে। খোঁজ শুরু হলো সবদিকে। টয়লেটে গেছেন কিনা তাও দেখা হলো। কোথাও নেই। বিরাট দুশ্চিন্তার বিষয়। মহিলা যদি নেমে পড়েন তাহলে তো সর্বনাশ। কে পাবে তাকে? ততক্ষণে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে যাবে। লোকটা পাগলের মতো খুঁজে চলেছে তার মাকে। মা নেই। ট্রেন থেকে নামছে। উঠছে। এদিক ওদিক দেখছে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। উপর বার্থের এক যাত্রী মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন- কোথা থেকে উঠেছেন আর যাবেন কোথায়? লোকটা কাঁপা কাঁপা গলায় জানালো- গুয়াহাটি থেকে উঠেছে, শিলচরে যাবে। টিটি উঠেছেন ট্রেনে। তিনিও ঘটনার কথা শুনে হতভম্ব। ধীর কণ্ঠে বললেন- হয়তো ভুলে অন্য কামরায় চলে গেছেন। তাড়াতাড়ি খুঁজুন। লোকটি হাসফাঁস করতে করতে নামলো। আমার শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে। অন্য কামরায় চলে গেলে শঙ্কার কিছু নেই। ট্রেনে থাকলে পাওয়া যাবে। কিন্তু নেমে গেলে সমস্যা। মহিলা বলে কথা। হোক তার মা। কিন্তু সবার কপালে চিন্তার ভাঁজ। মেয়েটা আমাকে প্রশ্ন

করলো- ট্রেন যদি ছেড়ে দেয় আর ওই মহিলা লামডিং থেকে যান! কী হবে? আমি চোখে চোখ রেখে বললাম- আমি কি চ্যাট জিপিটি? এতো কঠিন প্রশ্ন করছেন কেন! আমিও তো তাই ভাবছি।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও মায়ের সন্ধান নেই। যাত্রীদের উৎকণ্ঠা বাড়ছে। ট্রেন ছাড়ার সময়ও সন্নিকটে। কী হবে? যেমন তেমন ঘটনা নয়। মানুষ এভাবে হারাতে পারে? ট্রেন হুইশেল বাজিয়ে দিয়েছে। ইশ! কেমন একটা দুঃখজনক অবস্থা মনে নিয়ে ঘরে ফিরতে হচ্ছে। ট্রেন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে। তখনি আর এক ঘটনা ধরা পড়লো। জনৈক যাত্রী বললেন- ওই দেখুন বাচ্চাটা ঘুমে! আর ওরা নিচে থেকে গেছে। সবাই অবাক! কার বাচ্চা, কারা নিচে রয়েছে। হুলস্থূল পড়তেই দেখা গেলো- মিডল বার্থে এক ছেলে নিঝুম ঘুমে। এ কী শুরু হলো! ট্রেনের মধ্যে হাহাকার পরিস্থিতি। মা লাপাতা। মা খুঁজতে গিয়ে ছেলে গায়েব। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। বাচ্চাটার কী হবে?

ট্রেনের গতি বেড়ে গেলো। মিনিটের মধ্যে ট্রেন পুরো গতিতে ছুটলো। চোখের সামনে তিনটা মানুষের বিচ্ছেদ হয়ে গেল! আক্ষেপ হচ্ছে। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। টিটির পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন। বাচ্চাকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। সে চোখমুখ মুছে এদিকে ওদিকে নির্বাক তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ কার মুখে শোনা গেল- পাওয়া গেছে। দেখা গেল- মাকে ধরে নিয়ে আসছে সুপুত্র। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই। সিটে বসে ছেলে মাকে বকাবকি করছে। করবার কথা।

যে লোকটাকে লামডিং স্টেশনে নামানোর কথা ছিল সেও এগিয়ে গিয়ে মহিলার খোঁজ নিয়েছে। এসব দেখে মেয়েটা আমাকে ফিসফিস করে বললো- টিটির বেটাগিরি খতম। ও তো ট্রেনে থেকেই গেলো! আগের সেই বয়স্ক ব্যক্তি টিটিকে খোঁচা মারলেন- স্যার, সব ঝামেলা মিটেছে তো? টিটি চশমার উপর দিয়ে দেখলেন। কানা মনে মনে জানা। মাথা নেড়ে বললেন- হুম, আপনারা নিজ নিজ জায়গায় শান্তিতে থাকুন। গুড নাইট।

টিটি চলে গেলেন। মেয়েটার মুখোমুখি বসে এসির বাতাসে বেশ আরামে আছি আমি। উপরের বার্থে কেউ একজন জুবিন গর্গের 'ইয়া আলী রহম আলী' গান শুনছে। একটা প্রেম প্রেম ভাব অনুভূত হচ্ছে। না, এটা প্রেমের ব্যাপার নয়। কেউ মিশুক প্রকৃতির হয়ে গেলেই প্রেম হয় না। মেয়েটা অবশ্য মুখচোরা লাজুক নয়। আধুনিকতার ছোঁয়া তার সর্বাঙ্গে। গলা ভালো। কথায় মুগ্ধতা আছে। ট্রেন চলছে। সেই লোকটা তখনও তার মায়ের সাথে কী যেন বকবক করছে। আমি মনে মনে অনেক কথা ভাবছি। সব কথা খুলে বলা যায় না। সবকথা গল্পে প্রযোজ্য নয়। রাতটা এভাবে কেটে গেলেই হয়। মেয়েটার চেহারা লক্ষ্য করলাম। পিঠে ছাড়ানো চুল আর গাঢ় নীল রঙের জিনসে ফাইভ জি মডেলের মতো লাগছে। যাত্রার এই টাটকা স্মৃতি গল্পে জুড়ে দিলে পাঠক সুখি হবে। জেগে যখন আছি, মোবাইলে লেখালেখি করি। সময় সাশ্রয় হবে। পুজোর লেখার তাগদা মেটাতে পারবো।

অনেক্ষণ পর মেয়েটি আমাকে প্রশ্ন করলো- নেটওয়ার্ক আছে? জিজ্ঞেস করলাম- কল করবেন? সে তাচ্ছিল্যের সুরে বললো- না, না। এতো রাতে কল করে ডিস্টার্ব করবো কাকে? এই যে দেখছি ঘন ঘন ম্যাসেজ টাইপ করছেন। রিপ্লাই আসছে উল্টোদিক থেকে? মৃদু হেসে বললাম- ধুর! কী ভাবছেন আপনি! আমি একটা গল্প নিয়ে পড়ে আছি। লেখাটা শেষ হলেই বাঁচি। সে খানিকটা অবাক হয়ে বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলো- গল্প! কীসের গল্প? বললাম- গল্প আবার কীসের হয়? গল্প তো গল্পই। একজন মেয়েকে নিয়ে লিখছি। সে বললো- জানি, গল্প হলে একজন মেয়ে থাকবেই। একটা ছেলেও থাকতে হবে। না হলে কেস জমবে কী করে? আর তিন-চারটা ছেলে হয়ে গেলে ঘটনা জণ্ডিস হয়ে যাবে। পাতে কলাই ডাল জুটবে। সে সম্ভবতঃ রানী ভাবির ঘটনাকে ইঙ্গিত করছে। বললাম- না। এটা ভিন্নস্বাদের গল্প। সে হেসে ওঠে বললো- প্রেম, ধোঁকা-ঠোকা আছে তো! নাহলে বেগার পরিশ্রম হবে। পাঠক আকৃষ্ট করতে পারবেন না। ওর দিকে তাকালাম। মনে মনে বললাম- পাঠক আকৃষ্টের পন্থা আমি জানি। যখন লিখি, পাঠকের চাহিদার কথা স্মরণে রাখি।তাদের আশা আকাঙ্খার প্রতি নজর দিই। চাহিদা ও ভাবনার বিষয়ে সচেষ্ট থাকি। সাবলীলভাবে লিখি। মন মানসিকতা বন্দক রাখি না। মনের কথা মনে রেখে সত্য তুলে ধরা যায় না। বাস্তব উপস্থাপন হয় না।

ঘুমো ঘুমো ভাব চোখে। তবে গল্প বেশ এগিয়েছে। খুব আরামে আছি বলতে পারবো না। সটান হবার উপায় নেই। আইডিয়া যখন ফুরিয়ে যায় মোবাইল দেখি। কখনো চুপচাপ থাকি। মেয়েটা কথা বলে। আমি টুকটাক চালিয়ে যাই। সময় কাটে। এক সময় আসন ছেড়ে টয়লেটে গেলাম। এসে দেখি সে পা লম্বা করে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। ট্রেনের বাকিরাও ঘুমে। মাঝে মধ্যে দু-একজন নড়াচড়া করছে। আমিও একটু জিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম।

হাফলং পেরিয়ে আসার পর ট্রেন লাইনের শঙ্কা কেটে গেল। ধসের ঝুঁকি নেই। ট্রেন তার গতিতে চলছে। মেয়েটা এবার উঠেছে। ঝাপসা আলোয় দেখলাম- মাথার চুল ঠিক করে নিয়েছে। তারপর মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবার সেই রীনা ভাবির ভিডিও। তার মোবাইল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো- সাংবাদিকের প্রশ্ন আর ড্রাইভারের উত্তরটা শুনুন...। আমি তার মোবাইল হাতে নিলাম! সাংবাদিক প্রশ্ন করেছে- তুমি কি রীনার গাড়ির ড্রাইভার, নাকি রীনার? সে উত্তরে দিলো- রীনার গাড়ির ড্রাইভার। রীনারও...। সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করলো- ওর সাথে কয়বার শারিরীক সম্পর্ক হয়েছে? উত্তরে বললো- দুবার। আমি আর শুনতে চাইনি। এই ভিডিওটা আমি দুপুরে দেখেছি। মোবাইলটা ফেরত দিয়ে বললাম- ওটা সাংবাদিক নয়, সাঙ্ঘাতিক। ড্রাইভার যা বলেছে তাও বাম্পার। হয়তো মার খেয়ে বলতে বাধ্য হয়েছে। আদালতে গিয়ে বয়ান বদলে নিতে পারে। সে মোবাইল হাতে নিয়ে ভিডিওটা পজ করে বললো- কত বড় পাঁজি মহিলা জানেন? স্কুল লাইফে বাঘা বাঘা প্রেম করেছে। ওর মা'টাও সুবিধার নয়। পরকিয়া আর পালিয়ে বিয়ে করার রেওয়াজ ধরিয়ে দিয়েছে। কত সুন্দর সংসার, সন্তান, গাড়ি-

বাড়ি ছিল। সব বরবাদ করে দিলো। সম্পর্কে সন্দেহের বিষ ঢেলে দিয়েছে । স্ত্রীদের করেছে কলঙ্কিত। আর...!

থেমে গেল মেয়েটা। আমি প্রশ্ন করলাম- আর কী? সে আর আগ বাড়তে চাইলো না। শুধু বললো- আর শুনে লাভ কি ? লেখক মানুষ। গল্পে ফাঁস করে দেবেন। আমি যেন বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ পেলাম। আর কী সেটা জানতে উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। কিছুটা নাছোড়বান্দা হয়ে বললাম- আধা বলার অর্থ নেই। হেঁয়ালি করবেন না। স্ত্রীদের করেছে কলঙ্কিত। আর... কী ?

সে যেন অস্বস্তিতে পড়লো। কিছুটা ইতস্তত করে বললো- আর... আর কিছু নেই। নাম দিয়ে আমার মাথা খেয়েছে। ব্যস, আপনার গল্প লিখুন...!

রহস্যের জট খুলতে পারলাম না। গল্পে যবনিকা পড়ে গেল। নীরবে কাটলো অনেক্ষণ। কখন যে চোখ বুজে গিয়েছিল মনে নেই। একসময় ঘুম ভাঙলো। সে আমাকে বললো- খুব তো ঘুমালেন। গল্প লেখা শেষ? চোখ বুঁজে ছিলাম ঠিক। কতটা ঘুমিয়েছি জানি না। বললাম- গল্প নিয়ে হাফলং এসেছি। এখনও অর্ধেক বাকি। সে মৃদু হাসির ঝলক দিয়ে বললো- তাহলে তো ঘরে পৌঁছার আগেই শেষ হয়ে যাবে। আমি কিছু না বলে স্মিত হেঁসে মাথা নাড়লাম। সে বলতে থাকলো- গল্পে নিশ্চয় এই জার্নির কথাও থাকবে। সব নিয়ে লেখা হচ্ছে যখন হয়তো আমার কথাও থাকবে। আমিও গল্পভক্ত পাঠক। হেসে হেসে বললাম- জুড়ে দেব। আর কি সেটা বলুন আগে। সে কিছুটা অভিমানের ভঙ্গিতে হেসে বললো- আর...আর নিয়ে পড়লেন কেন? নাম জানতে চাইছেন? আর... মানে রীনা রায় চৌধুরী। গল্পের মেইন পার্টে রাখবেন। এবার আমি বুঝলাম- রীনা রায় চৌধুরী কেন আটকে গিয়েছিল। সেও যে রীনা। তার নাম কলঙ্কিত হয়েছে। ঘর পোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। বললাম- আর যাইহোক, নামে-মানুষে গল্প জমে উঠবে। দারুন বাস্তব। সে এবার নীতিশের মতো পাল্টি মারতে চাইলো। প্রশ্ন করলো- গল্পটা ফেসবুকে পোস্ট করবেন? বললাম- করতেও পারি। ভয় করছে? অবজ্ঞার সুরে বললো- ভয় করবে কেন? আমি কি এই নামে সিঙ্গেল পিস্! রীনা রায় চৌধুরী আরও অনেক আছে। বললাম- ধাপ্পা দিয়ে লাভ নেই। নাম ওটাই। মানুষ থেকে অনেক লম্বা। সেয়ানা মাল। প্রশ্ন করলো- আসল নাম বলেছি, আপনার বিশ্বাস হয়েছে? যেচে কথা বললাম আর গল্পে আগ্রহ দেখালাম বলেই কী এতো বিশ্বাস? চপ নয়, ঢপ খেয়েছেন। কাচুমাচু স্বরে বললাম- কেউ যদি বেইমানি করে তাহলে আর করার কী? নামের কী অভাব পড়েছে যে আমাকে রীনা রায় চৌধুরী নিয়েই গল্প লিখতে হবে। আমি শ্রাবন্তী নিয়ে লিখতে পারি। সোনম রঘুবংশী নিয়েও গল্প লিখতে পারি। চেনা জানা আরও অনেক আছে। নাম কোন ফ্যাক্টর না। সে এবার উৎসাহিত হয়ে বললো- তাহলে লিখুন। কেউ পড়ুক বা না পড়ুক, নিজের সৃজনশীলতাকে চেপে রাখবেন কেন। অনুভূতিকে হরফের মাধ্যমে সাজানো সহজ কর্ম নয়। সবার দ্বারা সম্ভব হয় না। লেখালেখিতে মন হাল্কা হয়। ভালো থাকে। চিন্তাশক্তির প্রসার ঘটে। মগজ খাটিয়ে ভালকিছু রচনা করতে পারলে সমাদৃত হওয়া যায়। আমি বললাম- থামুন, আমাকে লম্বা কলা খাওয়াবেন না। ম্যাগাজিনের জন্য তাগদা থাকে তাই লিখি। সে বললো- ওহ্ তাই নাকি! ভালো কথা। লেখার মাধ্যমে যে ভালবাসা এবং ভালবাসার সাথে যেটুকু পরিচিতি গড়ে ওঠে তা অন্য কিছুতেই সম্ভব না। শিক্ষিত এবং কাব্যপ্রেমী মানুষের ভালবাসা একমাত্র সৃজনশীল লেখা থেকেই আসতে পারে। সেটা পৃথিবীর সেরা উপহার।

দীর্ঘ আলাপচারিতার কয়েক কিস্তি পরে এক অপরিচিতা সুন্দরী অবশেষে রীনা হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। না হোক রীনা ভাবি, তবে দুধের স্বাদ ঘোলে মিঠলো। বিষয়টা অনুমান করলে অনেক বিরাট ব্যাপার। টুকরো টুকরো কথা এমনি এগোতে লাগলো। আজব ভাগ্য! ফুরাতে লাগলো পথ। ট্রেনের ভেতরে ফর্সা আলো ঢুকে জানান দিতে লাগলো ভোরের আর দেরি নেই। যাত্রীরা ঘুম থেকে উঠতে শুরু করেছে। অতিরিক্ত গল্প-গুজব উচিত নয়। অবস্থা বেগতিকে দুর্নাম হতে পারে। ট্রেন স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। থামলেই নেমে পড়বো।

কথায় আছে না- ভগবান যখন দিতে শুরু করে, চতুর্দিক খুলেই দেয়। আমারও সব দিক খোলা। অথচ আমি সংসার নিয়মে বাঁধা। কন্টকময় কোন পথে এগোবার ধান্দা আর নেই। সব গল্পে নায়ক সাজা যায় না। রানীকে নায়িকা করে গল্পটা চালিয়ে দিতে পারলেই হলো। ভালবাসা আর ভাললাগাতে তফাৎ থাকে। জীবন থেকে একটা পালক খসে পড়লে ক্ষতি কী! কত পালক জুড়েই তো সমৃদ্ধ হয়েছে এই প্রেমজীবন। তবে এই কাহিনী অন্যরকম। সাহিত্যে যে সরস প্রেম উঁকি মারে তারচেয়েও শাশ্বত সুন্দর! যেখানে পুনশ্চ দেখা হওয়ার কথা থাকে না আবার দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না। কেউ পায় না, কেউ পেয়ে হারায়। আমি পাইও বটে। হয়তো ভাষায় খুঁজে বেড়াই। ঈশ্বর কাউকে নিরাশ করে না। মন থেকে কিছু চাইলে আটারো আনার জায়গায় আটআনা দিয়েও মুখরক্ষা করে। এটাই স্রষ্টার অসীম উদারতা। আর মেয়েদের বোঝার ক্ষমতা কারোর নেই। ওরা যাকে দেয়, সবকিছু উজাড় করে দেয়। যাকে দেয় না, তার ম্যাসেজটাও সিন করে না। আর বিশ্বাসঘাতকতা করলে হানিমুনে নিয়ে মার্ডার করায় নতুবা কলাই ডাল খাইয়ে দেয়।

ট্রেন বদরপুর জংশনে থেমেছে। অনেকে নামতে শুরু করেছেন। আমাকেও নামতে হবে। মেয়েটা সম্ভবতঃ শিলচর যাবে। আর কোনদিন দেখা নাও হতে পারে। ব্যাগ কাঁধে নিয়ে নামতে যাবো তখনি রীনা বললো- পরিচয় ছাড়াই অনেক কথা হলো। বিনা যোগাযোগেও কোন কোন পরিচয় থাকে। আপনার গল্প আমি পড়বোই। ফেসবুকে প্রচুর ফ্রেন্ড ফলোয়ার আমার আছে। বেশিরভাগ সাহিত্য জগতের। তন্মধ্যে কেবিএসসি কবীর মজুমদার একজন। আমি থ হয়ে গেলাম। পেছন থেকে এক মহিলা ঠেলছেন। কোচের মাঝাখানে দাঁড়াবার সময় নয়। সারারাত সাপ মেরে সকাল হতেই লুঙ্গি! তবে কী রীনা আমাকে চেনে? সে তখন মিটিমিটি হাসছে!

<><><><><>

অদ্ভুত ঐশানী বৌমা

নন্দিতা নাথ

বসু পরিবারে আজ উৎসবের দিন। অরিজিৎ বসুর বিয়ে হয়েছে, আর আজই নতুন বউ ঐশানী প্রথম পা রাখল শ্বশুরবাড়িতে। ঐশানীকে দেখে সবাই মুগ্ধ --- তার ভদ্রতা, শান্ত হাসি, আর নিখুঁত ব্যবহার দেখে মনে হলো যেন বহুদিনের চেনা। শাশুড়ি বললেন, "এমন বউমা পেয়ে ঘরই বদলে যাবে।" প্রথম দিনেই ঐশানী রান্নাঘরে গিয়ে চমৎকার খিচুড়ি আর মাছ ভাজা বানাল। সবার প্রশংসা কুড়াল। দেবর বলল, "বৌদি, তুমি তো দারুণ রান্না করো! এত সুন্দর আর নিখুঁত কিভাবে সম্ভব?" ঐশানী শুধু হেসে উত্তর দিল, "শেখার চেষ্টা করলেই সবকিছু সম্ভব।" দিন গড়াতে লাগল। ঐশানী সবার খেয়াল রাখত - শ্বশুরকে ঠিক সময়ে ওষুধ দিত, দেবরের পড়াশোনায় সাহায্য করত, শাশুড়িকে গৃহকর্মে সঙ্গ দিত। এক কথায়, যে বাড়িতে সায়ন্তী এল, সেখানে হঠাৎ করেই এক ধরনের শৃঙ্খলা ও প্রশান্তি নেমে এলো। তবে অরিজিৎ কিছুটা অবাক হত - কোনো মানুষ কি এত নিখুঁত হতে পারে?

কোনো ভুল নেই, কোনো অসন্তোষ নেই, এমনকি বিরক্তি প্রকাশও নেই।

সব সময় একই রকম হাসি, একই রকম শান্ত স্বভাব। এক রাতে অরিজিৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখল ঐশানী জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর অন্ধকার, তবু তার মুখে এক অদ্ভুত আলো ফুটে উঠেছে, যেম আকাশের বজ্রপাত চার চোখে প্রতিফলিত হয়েছে।

অরিজিৎ ডাকল, "ঐশানী?" সে ধীরে ফিরে মিষ্টি হেসে বলল, "ঘুম ভেঙে গেল? কিছু না, শুধু আকাশটা দেখছিলাম।" কিন্তু অরিজিতের মনে হল - এই মেয়ের মধ্যে কিছু একটা আলাদা আছে। কিন্তু কী ? এক দুপুরে শাশুড়ি ঐশানীকে বললেন "বৌমা, রান্নাঘর থেকে এক বোতল সরষের তেল নিয়ে এসো।"

ঐশানী মুহুর্তের মধ্যেই গিয়ে তেল নিয়ে এল। অবাক হওয়ার বিষয় - সে বোতলটা ছিল রান্নাঘরের আলমারির একেবারে শেষ তাকের পেছনে।

সেখানে জিনিস খুঁজে পেতে শাশুড়িই হিমশিম খান। শাশুড়ি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন - "তুমি আগে কখনো তো রান্নাঘর ঘাটোনি, তাও এত তাড়াতাড়ি কেমন করে খুঁজে পেলে?"

ঐশানী হাসল "মনে হয় ভাগ্যই ভালো।"

কথাটা এড়িয়ে গেলেও, শাশুড়ির মনে প্রশ্ন থেকে গেল।

কয়েকদিন পর দেবর ঐশানীর কাছে পড়াশোনায় সাহায্য চাইতে এল।

গণিতের জটিল অঙ্ক, কলেজের বইয়ের রেফারেন্স - সব কাটাতে মুহূর্তের মধ্যে উত্তর দিয়ে দিল ঐশানী।

দেবর হতভম্ব হয়ে বলল - "বৌদি, তুমি তো ম্যাজিক! তুমি কি সব জানো নাকি ?" ঐশানী মিষ্টি হেসে বলল, "না রে, চেষ্টা করলে জানা যায়।"

কিন্তু দেবরের মনে কাঁপুনি ধরল - এমন সহজে কেউ কি এত জটিল অঙ্ক করতে পারে ? সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটল এক রাতে। ঝড়-বৃষ্টিতে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। ঘর অন্ধকার। শাশুড়ি দেখলেন ঐশানী একা দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। বজ্রপাতের আলোয় এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো - তারি চোখদুটো অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলছে, যেন ভেতর থেকে নীল আলো ছড়িয়ে পড়ছে। শাশুড়ি চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই আলো নিভে গেল। ঐশানী শান্ত গলায় বলল - "ভয় পেয়েছেন মা ? আমি তো আছি।" বিদ্যুৎ চলে যাওয়া রাতে ঐশানীর চোখে অদ্ভুত আলো ঝলমল করার পর থেকে বাড়ির পরিবেশ পাল্টে গেল। কদিনের মধ্যেই কাজের লোক বলল - "বউমা রাতে রান্নাঘরে একা একা দাঁড়িয়ে কি যেন বিড়বিড় করছে।"

আরেকদিন দেবর শোনে - ঐশানীর ঘর থেকে ভেসে আসছে এক অদ্ভুত গুনগুন শব্দ, যেন ধাতব আওয়াজ। পরিবারের সবার মনে একটাই ধারণা জন্ম নিল - বউমার মধ্যে ভূত ঢুকেছে।

শাশুড়ি ফিসফিস করে স্বামীর কানে বললেন, "ও তো এত ভদ্র আর নিখুঁত হয় নাকি ? নিশ্চয় কোনো আশরীরীর ছায়া লেগেছে।" অবশেষে পাড়ার এক ওঝাকে ডেকে আনা হলো। রাত ঠিক করা হলো ঝাড়ফুঁকের জন্য। ঐশানী কিছুই জানত না। রাত নামতেই সবাই মিলে তাকে বসানো হলো আঙিনায়। ওঝা মন্ত্র পড়ে ধূপধুনো জ্বালাল। চারপাশে ভয়ানক পরিবেশ। হটাৎ ওঝা চিৎকার করে উঠল - "বেরো! যে ভূত এই মেয়ের মধ্যে আছে, তাড়াতাড়ি বেরো!" ঐশানী ভীত স্বরে বলল - "আমি তো ঠিক আছি, আমাকে কেন এভাবে কষ্ট দিচ্ছেন ?"

কিন্তু মন্ত্র পড়তেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল - ঐশানীর গলা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল! কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল অস্বাভাবিক, ধাতবের মতো। সে বলল - "ভূত ? আমি ভূত নই।"

সবাই জমে গেল আতঙ্কে।

শাশুড়ি চিৎকার করে উঠলেন,

"ও মা গো! এ তো মানুষ নয়!"

কিন্তু ওঝাও থমকে গেল।

তার সারা জীবন এমন আওয়াজ সে শোনেনি। মন্ত্রে ভূত কেঁপে ওঠে, ভয় পায় - কিন্তু শুধু ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ওঝার দিকে তাকিয়ে রইল ঐশানী অরিজিৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার বুকের ভেতর ধপধপ শব্দ হচ্ছিল - এটা ভূত নয় ... তবে আসলে কী ? ঝাড়ফুঁকের রাতের পর বসু পরিবার আতঙ্কে আচ্ছন্ন।

শাশুড়ি বারবার বলছিলেন - "ও মানুষ নয়, আমি চোখে দেখেছি! ওর মধ্যে ভূত আছে।" কিন্তু অরিজিৎ চুপ করে ছিল।

তার চোখের সামনে তখনও ঘুরছে সেই মুহূর্ত - ঐশানির ধাতব স্বর, ঠাণ্ডা দৃষ্টি।

তবু সেই রাতের পর কিছু বদলে গেল।

ঐশানী যেন আরও বেশি যত্নশীল হয়ে উঠল অরিজিতের প্রতি। ভোরের আলো ফুটতেই অরিজিৎ মনে মনে প্রশ্ন করল -

"সে যদি মানুষ না হয়, তবে আমার প্রতি এত যত্ন কেন ? সে কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসে ?" এই অদ্ভুত বউ মন থেকে ভালোবাসে ?

বসু পরিবারে অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো জমতে জমতে একসময় ফেটে পড়ল।

কেউ কিছু মুখে বলত না, কিন্তু সবাই ভেতরে ভেতরে ভয় পাচ্ছিল।

এক রাতে ঐশানীর দেবরের খুব খিদে পেয়েছিল, সোজা রান্নাঘরে ঢুকে গেল। কিন্তু যা দেখল, তাতে তার গলা শুকিয়ে গেল।

ঐশানী রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে, হাতদুটো টেবিলের ওপরে রাখা।

হাতের তালু খুলে গিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে সূক্ষ্ম ধাতব তার আর ছোট ছোট আলো।

সে সেগুলো দিয়ে ভাঙা গ্যাস স্টোভ মেরামত করছে - যেন ওটাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

দেবর ভয়ে চিৎকার করে উঠল - "বৌদি মানুষ নয়! ও রোবট!" আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল চিৎকার শুনে সবাই ছুটে এল।

ঐশানী মুহূর্তের মধ্যে হাত গুটিয়ে নিল

শাশুড়ি আঁতকে উঠলেন, "হায় ভগবান! ও ভূত নয় ... তবে কী ?"

ঠিক তখনই বজ্রপাত হলো বাইরে। বিদ্যুৎ আবার চলে গেল। অন্ধকার ঘরে হঠাৎ সবাই দেখল - ঐশ্বানীর চোখ থেকে বেরোচ্ছে নীল আলো, তার শরীরের ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে যান্ত্রিক টিক-টিক শব্দ।

সবাই আতঙ্কে সরে দাঁড়াল। আর অরিজিৎ স্থির হয়ে গেল - সত্যের মুখোশ খসে গেছে। কিন্তু এটাই কি শেষ সত্য ? না কি আরও ভয়ংকর কিছু লুকিয়ে আছে ঐশানীর ভেতরে ?

বসু পরিবার অন্ধকার ঘরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। ঐশানীর চোখ থেকে তখনও বেরোচ্ছে হালকা নীল ঝিলিক। চারপাশে ভয়ের আবহ। ঠিক তখনই দরজা ঠেলে ভেতরে এলেন ড. সৌম্য বসু। তার হাতে টর্চলাইট, মুখেকঠিন অভিব্যক্তি। "যা হবার ছিল, হয়ে গেছে," -তিনি শান্ত স্বরে বললেন।

সবাই একসাথে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল -

"এ আসলে কে ? আমাদের বউমা না ভূত না... কী জিনিস ?"

ড. সৌম্য ধীরে ধীরে বললেন, "ও মানুষ নয়। ও আমার সৃষ্টি। একজন হিউম্যানয়েড এআই রোবট।" নাম - AI-Sha-N-E (পরিবর্তিত ঐশানী) সারা ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল।

শাশুড়ি কাঁপতে কাঁপতে বললেন,

"তুমি কি পাগল হয়েছ ? রোবটকে আমাদের ঘরে এনে বউমা বানালে ?"

ড. সৌম্য কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলেন -

"তোমরা বুঝতে পারছ না। ঐশানী শুধু যন্ত্র নয়। ও মানুষের মতো শিখতে পারে, আবেগ বোঝে, ভালোবাসতে পারে। ও ভবিষ্যতের পৃথিবী-যেখানে একাকীত্ব আর নিঃসঙ্গতা থাকবে না।"

পরিবারে তোলপাড় শুরু হয়। দেবর আর শাশুড়ি চায় ঐশানীকে তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু অরিজিত অদ্ভুত টান অনুভব করে- সে কি সত্যিই ঐশানীকে হারাতে পারবে ?

এই ঘটনার পর অরিজিৎ বুঝতে পারল- সেও তাকে হারাতে পারবে না।

সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল - "তুমি রোবট হলেও আমার বউ, আমার ভালোবাসা। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।"

তবে ঐশানী জানত -সে চাইলেও সাধারণ সংসারে টিকতে পারবে না। সমাজ তাকে মেনে নেবে না।

অবশেষে একদিন ঐশানী অরিজিতকে বলল -

"আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু আমাকে অন্যদের জন্য কাজ করতে হবে। আমার ক্ষমতা দিয়ে আমি যদি অনাথ শিশুদের মা হতে পারি বা, বৃদ্ধাশ্রমে অসহায় মানুষদের সেবা করতে পারি - তাহলে আমার অস্তিত্বের সার্থকতা।"

অরিজিত ভেঙে পড়লেও, তার চোখে এক গর্বের ঝিলিক ফুটে উঠল।

কিছুদিন পর থেকেই শোনা গেল - এক অদ্ভুত মহিলা অনাথ আশ্রমে শিশুদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। বৃদ্ধদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। তার নাম - ঐশানী।

কেউ জানত না সে মানুষ নাকি যন্ত্র।

কিন্তু যারা তার কাছাকাছি এসেছে, তারা শুধু বলত -

"ও তো একেবারে মায়ের মতো।"

আর দূরে বসু বাড়ির এক কোণে অরিজিত প্রতিদিন রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে - "আমার বউ, শুধু AI_SHAN-E- নয় আমার বউ ঐশানী বৌমা।"

<><><><>

জীবন প্রবাহে

সুস্মিতা মজুমদার

পূজোর এখনও মাস দুয়েক বাকি। তবুও চারিদিকে সাজ সাজ রব। বাজারে আগুন লেগেছে বলে সারাক্ষন সকলেই যত হা-হুতাশ করুক তবু পুজো তো বৎসরে একবারই আসে। সাধ্যমত সবার বাড়িতেই পূজোর কেনাকাটা চলে। মধ্যবিত্তের বাড়িতে সাধ আর সাধ্যের টানাপোড়েন চলে। সন্তুষ্টি আর অসন্তুষ্টির দোলাচলে দুলতে থাকে সংসারগুলো।

মিলন নগরের আবাসিক এলেকার মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত মিলে প্রায় ত্রিশঘর মানুষের বাস। প্রায় প্রতিটি বাড়িতে এক দুই ঘর ভাড়া আছে। অন্তরে যাই থাকুক বাইরে সকলের একতার বাধনে বাঁধা পড়ে আছেন।

পূজো এলেই সুমিত্রার মন নেচে ওঠে। কি যেন এক এজানা পুলকে ওর মনটা নেচে ওঠে। তিন ভাই বোন সহ বাবা মা, এই পাঁচজনের সংসার চালাতে বাবা রসময় দেব চৌধুরীর বেশ কষ্টই হয়। তাই বিলাসিতার কথা তাদের সংসারে একেবারেই অচল। আপন ভোলা রসময় বাবু-র মাথায় সারাক্ষন সাংস্কৃতিক জগতের নানা কর্মকাণ্ডের কথাই ঘুরতে থাকে। যার থেকে কোন প্রাপ্তি নেই আছে শুধুই শুদ্ধ মনের আনন্দ।

রসময় দেব চৌধুরীর পাশের বাড়িটা ছিল বেদব্রত মজুমদারের। বেদব্রতবাবুর একমাত্র সন্তান চাকরি সূত্রে মুম্বাই থাকে। কিন্তু গত দুবৎসর যাবৎ তিনি মুম্বাইবাসি। স্ত্রী মিত্রার শারিরীক সমস্যার জন্য তাকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হচ্ছিল বলে শেষ পর্যন্ত ছেলের কাছেই চলে গেলেন। গত ছমাস আগে এসে দুটো ঘর নিজের জন্য রেখে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে যান সুপীপ্ত সেনগুপ্ত, কোন এক প্রাইভেট কোম্পানি-র উর্ধতন আধিকারিক মা, স্ত্রী এবং দুই বৎসরের কন্যাকে নিয়ে ঐ বাড়িতে থাকতে আসেন। ভাড়া দেওয়ার সময় মজুমদার সুদীপ্তকে বলেন - বাড়িটাকে নিজের বাড়ি ভেবে থাকেন। পুরো বাড়ির দায়িত্ব আপনার। ম্যান্টেইন্যান্সের হিসাব রেখে ভাড়া থেকে কেটে রাখবেন। বৎসর দুইবৎসরে সপ্তাহখানেকের জন্য আসতে পারি। বাকি আপনার দায়িত্ব।

সেনগুপ্তবাবু খুবই শৌখিন মানুষ। বাড়ির সামনে সুন্দর ফুলের বাগান করেছেন। বাড়ির দুইপাশে আর পিছন দিকে সব্জি বাগান। চারিদিক ঝকঝক তকতকে। ঘরে আসবাব পত্রের বাহুল্য নেই। যতটুকু আছে সবই আধুনিক ডিজাইনের। ঘরের সঙ্গে মানানসই আর পরিপাটি। স্ত্রী বিপাশাও খুব গোছানো স্বভাবের। মা সরযূ দেবী সারাদিন টুকটুক কাজ করে চলেন। এতটুকু শ্রান্তির চাপ পড়ে না চেহারায়। হাসিখুশি সহজ সরল সংসার অন্ত প্রান মহিলার।

ওই বাড়িতে সুমিত্রার জন্য চব্বিশ ঘন্টাই অবারিত দ্বার। প্রথমেই বিপাশাকে কাকিমনি বলে ডেকে ফেলেছিল তাই, তা না হলে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল বেশি। পুতুল পুতুল টুসিকে নিয়ে সময় কাটাতে খুব ভাল লাগে সুমিত্রার। গল্পে কথায় কোথা দিয়ে সময় পেরিয়ে যায় মনেই থাকে না সুমিত্রার। তারপর মায়ের ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসে।

দিন যায় রাত পোহায়, কত ঘটন-অঘটন নিত্যদিন ঘটে চলে আমাদের চারপাশে। সংসারের চাকাও ঘোরতে থাকে একই সুখ দুঃখ আনন্দ কোনো পাওয়া না পাওয়ার হিসাব কষতে কষতে। সুমিত্রা ও ধীরে ধীরে বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে ওঠে। চারিদিকের পৃথিবীর নানা ঘটনা এখন ওর মন ছুয়ে যায়।

শুধু পূজোর সময় এলেই সুমিত্রার মনটা খচ্ খচ্ করতে থাকে। পূজোর দুমাস আগে থেকেই বিপাশার শাড়ী কেনার উন্মাদনা। প্রায় প্রতিদিন বাজারে বেরিয়ে যাওয়া, নিজের জন্য প্রচুর কেনাকাটা করা গেলে যে সুমিত্রা কিছুটা ঈর্যাকাতর হয়ে পড়ে না, সেকথা হলপ করে বলা যাবে না। যতই হোক মেয়ের মন তো ?

কাকুর কাকীমনিকে সন্তুষ্ট রাখার বা খুশী করার প্রচেষ্টা বিপাশার খুব ভাল লাগে। কাকীমনিকে খুব ভাগ্যবান মনে হয়. আসলে সব মেয়েরাই তো এমন স্বামীই কামনা করে। অন্যদিকে ওর নিজের বাবা মায়ের মধ্যে ও তো তেমন বিরোধ নেই তবু বাবা মায়ের আশা পূরণের কোন চেষ্টা করতে দেখেনি। হয়তো বাবার সাধ্য নেই তাই মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখেন। তাছাড়া বাবার কাছে এসব মেয়েলি আবদারের মনে হয় কোন মূল্য নেই।

একটা ব্যাপারে অবশ্য বিপাশা খুবই নিশ্চিত। গান বাজনা কাকু কাকীমনিও ভালবাসেন কিন্তু ক্লাসিকেল নয়। টাকা খরচ করে ক্লাসিকেল গানের আসরে তারা কখনই যান না। তার বদলে হিন্দী সিনেমার আর্টিষ্ট এলে। হিন্দী গানের আসর হলে সেখানে দামী টিকিট কেটে দেখতে যাবেন অবশ্যই।

সুমিত্রার যা বয়স এই বয়সে সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি আর বস্তুবাদী মানসিকতার মধ্যে পার্থক্যের হিসাব নিকাশ করার বয়স নয়। নিজের বাড়ির সাংস্কৃতিক পরম্পরা আর কাকীমণির বস্তুবাদী আলাপ আলোচনা দুটোই ওর কাছে সমান উপাদেয়। কৈশোরের স্বাভাবিক উচ্ছলতা, একটু চোরা চাউনি, একটু আশকারা সবই কাকীমার সঙ্গে অনায়াসে আলাপ করা যায়।

হঠাৎ করেই একদিন কাকীমনিদের বাড়িতে কাকুর খুড়তুতো ভাই শান্তনু এসে উপস্থিত। ওকে দেখে কাকীমণি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। শান্তনুর সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখি বিপাশার চোখে লাগে। কিন্তু দিদা বা কাকুর কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে দমে যায় বিপাশা। ওর চোখে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকে।

এভাবেই দিন চলে যাচ্ছিল। বিপাশার হাইয়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে। সামনের কিছুদিন অখণ্ড আসর। প্রতিবৎসরের মত সেবারও বৈশাখ মাসের আগে আগে কাকীমনি বাপের বাড়ি

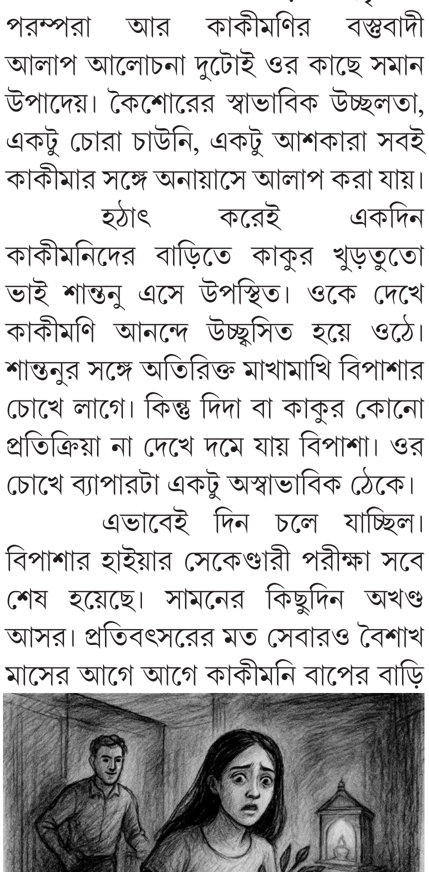

যাওয়ার জন্য তৈরী হলেন। এই সময়ে এবারই শেষ যাওয়া যাবে না।

কাকিমণি যাওয়ার পর মাঝে মধ্যে দুপুরে দিদার খবর নিয়ে আসে সুমিত্রা। সেদিন দিদা সুমিত্রাকে বললেন, ‘কয়েকটা নিমের তাল দিয়ে যাস্, তো দিদি। গায়ে চুলকানি হয়েছে। নিম পাতা সিদ্ধ করে এই জল দিয়ে স্নান করব।’ পুরনো দিনের মানুষ, কথায় কথায় ডাক্তারের শরনাপন্ন হতে খুবই আপত্তি। তারচেয়ে ঘরোয়া ... বেশী বিশ্বাসী।

সুমিত্রাদের বাড়িতে একটা বড় নিম গাছ আছে। কিন্তু ডালগুলো উচুতে। ওর পক্ষে ডাল পাড়া সম্ভব নয়। তাই বিকালের দিকে একটা লোক ডেকে বেশ কিছু ডাল কাটিয়ে রাখলো। সন্ধ্যার পর ডালগুলো নিয়ে দিদাকে দিতে গেল। কাকু অফিস থেকে ফিরেছেন তাই দিদা কাকুর জন্য তা করছেন। সুমিত্রা নির্দ্বিধায় বেডরুমে ঢুকে গেল। ওকে দেখে সুদীপ্ত বললো, - ‘দেখ একটা শো পিস এনেছি।’ বলে সো পিসের সুইচ্ টা অন করে টিউব লাইট-টা অফ করে দিলেন।

মার্বেল পাথরের সুন্দর একটা মন্দির। সুইচ অন করতেই তার মধ্যে এক মায়াময় নীল আলো জ্বলে ওঠে সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরই নীল আলোর বদলে সবুজ আলো জ্বলে ওঠে। তন্ময় হয়ে চেয়ে দেখছিলো সুমিত্রা। আচমকা সুদীপ্ত তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে বুকে টেনে নিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় বিভ্রান্ত সুমিত্রা নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। অপর দিকে সুদীপ্ত প্লিজ বলে সুমিত্রার ঠোঁট খুঁজতে ব্যস্ত। ঝটকা দিয়ে সুদীপ্তকে ছাড়িয়ে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সুমিত্রা। কিন্তু বাড়ি ফিরে যায় না। আকস্মিক ঘটনা প্রবাহ থেকে ধাতস্ত হতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। রাগে দুঃখে অপমানে ফুঁসতে থাকে। নিজেকে বড় অশুচি অপবিত্র লাগে। কোন দোষ না করেও নিজেকে দোষি মনে হয়।

পরের কয়েকটা দিন অত্যন্ত খারাপ যায় সুমিত্রার - আর বোধহয় কাকীমণির মুখোমুখি হতে পারবো না। কাকুর দিকে তো তাকাতে পারবই না। একবার ভাবে কাকীমনিকে সব বলে দেব? তারপর ভাবে, তার কথা কি বিশ্বাস করবে? উলটে ওকেই দোষি ভাববে। কিন্তু সুদীপ্তকে সে কোনদিনই ... করতে পারবে না একথা নিশ্চিত।

কিন্তু, আশ্চর্যের ব্যাপার। সময়ে সব উলটো হয়ে গেল। কাকীমা বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসেই ওকে ডেকে কত মজা করেছে, সে সব গল্প শোনাতে লাগলো। প্রথমে একটু বাধো বাধো ঠেকলেও সে খুব সহজেই কাকীমার কথায় যোগ দিল। টুসির সঙ্গে খেলায়ও মেতে উঠলো। এমনকি সুদীপ্ত এসে যখন জিজ্ঞেস করলো, ‘কিরে পরীক্ষার রেজাল্ট কবে দিচ্ছে,’ - সে কথার জবাব ও সে সহজ ভাবেই দিতে পরল। নিজের আচরনে নিজেই অবাক সুমিত্রা।

ইতিমধ্যে অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে। সুমিত্রার নিজের একটি মেয়ে আছে। সেও বালিকা থেকে কিশোরী হবে একদিন। জীবনের অনেক অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে একটা কথা বুঝতে পেরেছে, সুদীপ্তর পত্নী প্রেম মিথ্যা ছিল না। সংসার এভাবেই চলে। জীবনের নানা ঘটনা সময়ের স্রোতে ধুয়ে মুছে যায়। যা শাশ্বত যা সত্য, তাই শুধু বেঁচে থাকে। এই সংসারের স্রোত নিরন্তর বয়ে চলে যায়।।

<><><><><>

শারদীয় উৎসব উপলক্ষে হাইলাকান্দি জেলার আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
এই উৎসব সবার জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক এই শুভ কামনায় -

রথীন্দ্র নাথ
অধ্যক্ষ
লালা উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়, লালা

শুভ শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন।

তপন প্রজাপতি
খন্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক,
লালা শিক্ষা খন্ড

জুবিন গর্গ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

হিফজুর রহমান লস্কর

চির নিদ্রায় চলে গেলে তুমি
হে সঙ্গীত সম্রাট জুবিন দা,
কণ্ঠে তোমার ধ্বনিত মানবতার সুর
মোরা কেমনে ভুলিব তা।

বহু ভাষায় সফল সঙ্গীতজ্ঞ
অসমের গৌরব জুবিন দা
একাধারে বাংলা হিন্দি অসমীয়া
মোরা কেমনে ভুলিব তা।

আকাশে বাতাসে মর্মর ধ্বনি
কণ্ঠটা কী অপূর্ব,
" সুখে থেকো ভালো থেকো
দূর থেকে চাইবো।"

সঙ্গীতের জাদুকর জুবিন দা
সত্যিই তুমি অনন্য,
ভারতবাসী ভুলবে না কভু
জাদুকরী কণ্ঠের জন্য।

হে সঙ্গীত গুরু! অমর তুমি
সার্থক জনম এ ধরায়,
ভগ্ন হৃদয়ে লাখো জনতার ভীড়ে
জানাই অন্তিম বিদায়।

লাখো ভক্তের ভালোবাসার টানে
আবার ফিরে আসবে,
" তোমার জন্য মনের দোয়ার
খোলা যে রইবে।"

<><><><><>

চলমান মুখোশ

শিপ্রা শর্মা

চলমান জীবন ছবি,ভাসছি নদীর স্রোতে
বাস্তব বা কল্পনা, কি আসে যায় তাতে?
ভাসছি সবাই সাগর জলে, ধরছি খড়কুটো,
সংসারের হাল ফেরাতে হাড়িগুলো যে ফুটো।
চলছে জীবন নদীর মত, নদী থেকে সাগর
যে যার বৃত্তে ঘোরে ,কে কারে করে আদর?
জীবন খানা বইতে ভালো, হাল ধরলে অন্য,
মহারণ্যে কাটছে সময়,সবাই যে তাই বন্য ।
বোঝে না কেউ কারো মন, উল্টো পথে চলা,
হাসির ছলে চলছে জীবন, শুধুই ছলাকলা।
মুখোশ নিয়ে মাতামাতি, মুখোশ হলো সার
দিন ফুরালে নেভে আলো ,তখন কে কার?

<><><><><>

প্রেয়সী কন্যা

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

দেখতে দেখতে অনেকটাই ক্লিন্ন হয়ে গেল
ম্লান হতে চলেছে তার আলোর ঝলকানি।
এই তো নিয়ম, এই তো ভবিতব্য
তবু নিয়মের ছকে থেকে কে আর বোঝে এইসব ?

আমি আজও পাগলপারা, আলোর ছটায় দিশেহারা
খুঁজে ফিরি সেই উচ্ছ্বাস, সেই উছল আলোর বন্যা
যখনই আমরা সমীপবর্তী
কিংবা একান্নবর্তী খানিক
আমি তাকাই অপলকে, সটান কিংবা আড়চোখে
চিরকালীন ব্যর্থতার কথা ভুলে, খুঁজি আর খুঁজি
একটু প্রশ্রয়, ঝলকানি দিয়েও যা
মিলিয়ে যায় সতত - বরাবরেরই মতো।

তবু রোজ রাতে, কে যে আমাকে এগিয়ে দেয়
আলোর কাছে, কোন সে টানে - জানি না।
জানি শুধু সে কাছে এলেই আমি এক অন্য মানুষ,
আর সে চিরকালীন বিস্ময় হয়ে দাঁড়ায় এসে পাশে।
আমি মরি লজ্জায়, প্রেয়সী-কন্যা বাতিঘর সকাশে।

<><><><><>

একটি ভুল ছড়া

ভক্ত সিং

ওরে মন ---
ডাট মারা ঝুঠা এ জীবন ।
এর চে ভালোই ছিলো
মুক্ত মনের কথা ----
একে অন্যে গাইতো বসে
গভীর প্রাণের কথা ।

লোকেরা কেন বোকা নয়রে
বুঝে নেয় যত কিছু
শিল-নোড়া তে গুড়িয়ে দেয়
ডাট মারা সবকিছু ।

ভুল ভুল --- ভুলের ছড়া
ভুলের'ই কেবল আমি
ভুলের ভেতর ভুল হয়ে যায়
বুঝবে কি ভাই তুমি ।

<><><><><>

আকাশে ছবি আঁকা

নির্ঝর হোসেন লস্কর

ভাবছি আমি, হব আমি
আমার মতো করে,
তবু চলার পথে
হই না আমি
আমার মতো আমি।।
চলার পথে হোঁচট খেয়ে
মন হয়ে যায়
পাথরের নুড়ি।
ভাবছি আমি, হব আমি
আমার মতো আমি।।
তবু চলার পথে
হই না আমি
আমার মতো আমি।।
ভাবছি আমি চাঁদ ধরবো
হয় না আকাশে উঠা
সিড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে
হুড়মুড়িয়ে পড়ি।।
চাঁদের বুড়ির চরকা কাটা
কেমন করে কাঁটে
তাও হয় না
মেঘের কাছে
কাঁদে বুড়ি
মুখ লুকিয়ে
যায় না ধরা।
এবার আকাশটা
ধরতে গিয়ে
সেও চলে যায় দুরে
হয় না ধরা
যায় না আর
আকশের বুকে
নীল ছবি আঁকা।।
<><><><><><><>

সাইরং রেলপথ

ডঃ লক্ষী নিবাস কালোয়ার

সাইরং রেলপথ
নির্মিত ঝকঝক
চলছে নিত্য নৈমিত গাড়ি ।
পাহাড়ের সবুজ দিয়ে
পাথরের গোহা দিয়ে
সাইরং থেকে সুদূর দিল্লী পাড়ি ।
কুতুব মিনার থেকে উঁচু পুল
প্রধানমন্ত্রী দিলেন অকূল
আরেক সম্পর্ক বিপ্লব উপহার।
<><><><><><>

সমীকরণ

বিশ্বজিত নাগ

মিথ্যে সুখের সাগরে খেলে ইচ্ছা অনিচ্ছার
রঙিন পালক
ভাসতে ভাসতে খুঁজে চলে বিগত ক্ষণের
সুখস্মৃতি,
দুইয়ের মধ্যে চলে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির ভালো
মন্দের সাতকাহন।
জীবন বয়ে চলে নদীর মতো আবহমান
কাল ধরে
মনের না পাওয়া ইচ্ছা গুলোকে বেঁধে
রাখতে চায় স্বপ্নের মোড়কে,
না বলা কথাগুলো সযত্নে জমিয়ে রাখে
জন্ম জন্মান্তরের সুখের বসন্তে,
কাটে অযুত প্রহর প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তির
অপেক্ষায়।

চক্রাকার প্রকৃতির লীলা বৈভব অকৃত্রিম
সৌন্দর্যময়-
সুখ দুঃখের বর্ণমালায় লিখে রাখে জীবনের
স্বরলিপি,
সময় বদলায়,এগিয়ে চলে বহমান সাবলীল
ধারায়
ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি থেকেই জন্ম হয়
সফলতার স্বপ্নবীজ।

মরীচিকা বিভ্রমে কেটে যায় সুসময়ের
অনর্থ বেলা
ফিরে আসে না সোনালি অতীত, নানা
রঙের দিনগুলি ,
রেখে যায় পুনরাবৃত্তির অমূল্য রেশ স্মৃতির
পাতায়।

সময় সংলাপ ভুলে যায় না বিগত দংশিত
দিনলিপি
আজও ঘটে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নতুন
সমীকরণের প্রত্যাশায়।
<><><><><><><>

এইসব ভয়ানক অন্ধকারে

জসিম উদ্দিন লস্কর

এইসব ভয়ানক অন্ধকারে
মৃত্যুর মতো রাত নেমে আসে
চারিদিকে জীবনের হাহাকার
দূরে কোথাও একফোঁটা জাফরানী আলো
জেগে আছে স্বপ্নের মতো
মানুষ নয়, মানুষ নয়
শুধু নামেই পরিচয়
পথহারা বিড়ালের আগমন
তবু এইসব রাতে মনুষেরা কাঁদে
ভাষাহীণ প্রাণী বুঝে,
এইসব হৃদয়ের ভাষা
অবশেষে মানুষ কিনা
শুধু মানুষ হয়।
<><><><><><><>

জুবিন দা

(কবিতায় জুবিন দাকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি)

মাধব দেবনাথ

আশার প্রদীপ জ্বেলে পরিসমাপ্তি ঘটে
একটি যুগ একটি অধ্যায়।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপরে প্রান্তের
লক্ষ লক্ষ শ্রোতা জনতার হৃদস্পন্দন
অসম মাতৃর সুসন্তান জুবিন দা
সংগোপনে খুঁজে নেয় এক নতুন জগত
রেখে যায় শুধু
শব্দ সুরের মূর্ছনা হৃদয়ের অন্তরালে।

শিবরঞ্জনী সুরের তরঙ্গ ভেসে আসছে
সিঙ্গাপুর থেকে কাহিলীপারা,
উজ্জ্বল নক্ষত্রটি হঠাৎ
খসে পড়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে
অশ্রুসিক্ত লক্ষ লক্ষ তারকার সমদল
স্তম্ভিত, বাকরুদ্ধ,হতাশ,হিতাহিত শূন্য
ভাসছে দুঃখের মহাসমুদ্রে ।
রিক্ত স্থান পূরণ করবে কে!
পাব কি আবার সুরের সঙ্গমে
হার্টথ্রব জুবিন দাকে আমাদের মাঝে
বা নতুন দিনের সোনালী কিরণে
তাকিয়ে থাকা লৌহিত্যের কাঁশবনে।
<><><><><><><>

জুবিন দা স্মরণে কবিতা

হ্যালো আমি জুবিন বলছি

দিলওয়ারা বেগম

আমি জুবিন তোমাদের জুবিন
তোমাদের নয়ন অশ্রুসিক্ত কেন
আমি চাইনি কোনদিন
তোমাদের নয়ন হতে অশ্রু ঝরুক ।
আমি জুবিন তোমাদের জুবিন
আমি গানকে ভালোবেসে
গেয়েছি মানুষের গান
গেয়েছি জীবনের গান
চেয়েছি তোমাদের মুখ হাসিতে ভরুক ।
আমি জুবিন তোমাদের জুবিন
আমার কোন জাত নেই
আমার কোন ধর্ম নেই
আমি মুক্ত ,কাঞ্চনজঙ্ঘা ।
আমি জুবিন তোমাদের জুবিন
গানের ভেলায় ভেসে
গানের মাধুরীতে মিশে
খুঁজেছি মানুষের সংজ্ঞা ।
আমি জুবিন তোমাদের জুবিন
এ দেহের মূল্য নাই
পুড়া দিলে হইবে ছাই
বুঝেছিল মন সেদিন ।
আমি জুবিন তোমাদের জুবিন
আমার সুরের মূর্ছনা
গুঞ্জরিত হবে বাতাসে
থাকবো তোমাদের বুকের গহিন।

<><><><><>

সন্ধ্যাতপ

অনুপম দাশ

ওগো অস্তরাগিনী,
তুমি তরুণ প্রেমিকের নির্বাক সাক্ষী ;
তার প্রণোচ্ছাস যৌবনের।
কত বিরহী রচিয়াছে ছন্দে,
তার বিরহগাথা ; তোমার অস্তাচলে।
আমি অতীতের প্রেমিক, বিস্মৃতির
আড়ালে;
আজও ভালোবাসি তোমায় - সন্ধ্যাতরুণা ।
এখন আর সেই আবেগ নেই যদিও,
ভালোলাগে আজও অজানা কারণে।
ক্লান্ত দিবসের শেষে তোমার শীতল
আলিঙ্গন,
অবসাদ ভূলে যাই এই সন্ধিক্ষণে।
জীবনের আয়ুরেখা এখন চরম শিখরে,
ধীরে ধীরে বাঁকিবে সে তাও যে মানি।
হয়তো বার্ধক্যের ভারে সেদিন অচল তনুবর,
সন্ধ্যার আরতীর সাথে মিনতি করিবে ;
আমায় নিয়ে চলো, নিয়ে চলো....
আজ দিবসের শেষে।
ওগো অস্তরাগিনী।

<><><><><>

অন্তরালে

শিবানী গুপ্ত

অরূপ খেলা রাতের বেলা
আকাশের বুক ছেয়ে,
চাঁদের হাসি জোছনা রাশি
দেখি শুধুই চেয়ে।

লক্ষ বুটি   তারার জুটি
গগন জুড়ে হাসে,
ভালো লাগে আবেশ জাগে
পুলক ছোঁয়া রাশে।

সৃষ্টির এ রূপ খুব অপরূপ
তাকাই যেদিক পানে,
ঝর্ণা পাহাড় ফুলের বাহার
কার সে অরূপ দানে!

প্রভাত রবি আলোর ছবি
মাতায় মনটা রূপে,
মনটা পাগল খুলে আগল
সন্ধ্যা তারা চুপে।

অন্তরালে   সৃজন তালে
কোন্ সে শিল্পী আড়ে!
যুগ যুগান্তর রন নিরন্তর
রচেন সকল সারে।

<><><><><>

অমৃত সন্ধান

মীনাক্ষী চক্রবর্তী সোম

নৈঃশব্দের পুষ্ট বেষ্টনী আমার চারপাশ ঘিরে
স্পর্শ করে সুর তুলেনি হৃদয়তন্ত্রে
সৃষ্টির অপেক্ষায় শুধু কান্না ঝরে, একান্তে
অশ্রুকণা ফুলে ফেঁপে শব্দের আশ্রয়ে স্ফীত,
চিরে খান খান হয় নৈঃশব্দের একলা বিলাস
সশব্দ দুর্বিনীত শোক গলে পড়ে
আকস্মিক ফাল্গুনী বন্যায়
বসন্ত আসে অসময়ে।
আমি কোকিল হয়ে ঘুরি এগাছ, ওগাছ।
ভারসাম্যহীন নীল দিগন্তে ভাসে
আদিম ইচ্ছের অকারণ চঞ্চলতা
সবুজ গালচে বিছানো মনগহনে
নীরবতা ভেঙে রঙ ছড়ায় লাল হৃদয়।
ভালোবাসা পুষ্ট তোমার বিস্তৃত বুকে
স্বল্প সময় হৃদয় ঝরে, ঝরুক পড়ে
সেই পরিপূর্ণতায় স্নাত হোক বিশুদ্ধ প্রেম।
তলিয়ে যাবার আগে
অন্ধকারের শুশ্রূষা দিয়ে
আলোকিত করে দাও হৃদয়ের দখিন দুয়ার
তোমার শৈল্পিক চিন্তায়
আমাকে সাথী করে নাও।
চলো ভেসে যাই অজানার অমৃত সন্ধানে।।

<><><><><>

গরবিনী বাঙালি

পূর্বা দাস

ঝরা পাতাগুলো আজও স্বপ্নের ঘোরে নষ্টনীড় খোঁজে,
সঙ্গীহারা বিহঙ্গেরা ক্লান্ত-
বৃষ্টিভেজা পালকে হারানো সভ্যতায় ফেরে,
রবীন্দ্রের ক্ষ্যাপা আজও লক্ষ্যে স্থির পরশমনির
আশে, বলাই খোঁজে শান্তি-প্রকৃতির কোলে এসে,
সন্ধ্যাতারা দিব্যি বসে বাঁকা নৌকার মাঝে হাসে,
চাঁদের সে কি অভিমান! কোমলতার আচ্ছাদনে।
ভালোবাসি বলেই ফেরার একরাশ তুমির দল,
বিজাতীয়ের মোহে পড়ে স্মরণীয় মাইকেল।
আমরা বাঙালি গরবিনীর দল সমাপ্তিতে নীড়ে
সহায়, বাংলার প্রাণ, বাংলার মান, বাংলার
গান সমস্বরে গায়; কমলা থেকে সত্যেন্দ্রের-
বলিদানের ভাষা আমার বাংলা, সহস্র শহীদের
রুধিরে রাঙা আমার প্রাণ আমার বাংলা।

<><><><><><>

ব্যক্তি বিশেষ

সাহসী কবি আশুতোষ দাস

উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্য চর্চায় আশুতোষ দাস এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। কবি আশুতোষ দাসের পরিচয় আর নতুন করে দেবার অপেক্ষা রাখে না। আসামের বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলা থেকে স্বকীয় চেষ্টায় ইন্টারনেট প্রযুক্তির বদান্যতায় আশুতোষ দাস এখন ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রবাসী বাংলা পাঠকের কাছে সমাদৃত ও চর্চিত নাম। প্যারিস, আমেরিকা, লন্ডন, কানাডায় তার কবিতা ও কবির সৃজন কর্ম আলোচিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কবির কবিতা ও গল্প ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। হিন্দিতে অনুবাদ করে গ্রন্থিত বই প্রকাশ করেছেন বালার্ক সম্পাদক ও কবি অশোক বার্মা "আশুতোষ দাস কী কবিতা" গ্রন্থে। ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন কবি কল্লোল চৌধুরী" টুফুট প্রিন্ট ইন দি ট্রেন অব টাইম" কবিতা বইয়ে। অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন নীরদ শাস্ত্রী। এই কবির কবিতা মনিপুরী ও অন্যান্য প্রতিবেশী ভাষায় অনুবাদ অনেকে করেছেন। গল্প অনুবাদ করেছেন কল্লোল চৌধুরী ইংরেজিতে লীলাবতী রিয়াং। একাধিক ইউনিভার্সিটি পাঠ্যসূচিতেও তার কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্ববধানে ইয়াসমিন নীহার আশুতোষ দাসের 'গল্প ও সমাজ বাস্তবতা।' নিয়ে এম ফিল গবেষণা করেছেন। ২০০০ সালে জেদ্দার আন্তর্জাতিক সাহিত্য পত্রিকা সম্প্রীতি থেকে পেয়েছেন আন্তর্জাতিক স্বর্ণপদক। ওয়ার্ল্ড রাইটার্স ফোরামের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক টেলভিশন ব্যক্তিত্ব ও লন্ডন গ্লোভাল টেলিভিশনের সঞ্চালক কবি শাহাজাহান চঞ্চল তাকে নিয়ে অনেক প্রোগ্রাম করেছেন এবং তার অনেক লেখা ঢাকার দৈনিক 'সত্যের আলোয়' প্রকাশ করেছেন। আন্তর্জাতিক লেখক দম্পতি গুলশান চৌধুরী ও নাজমুল চৌধুরী সম্পাদিত সম্প্রীতিতেও কবি আশুতোষ দাসের লেখা নিয়মিত ছাপা হয়েছে। "সম্প্রীতি" আন্তর্জাতিক কাগজে নিয়মিত লেখার কারনে সেই সময় থেকে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত হয়ে যান। যে সময় ইন্টারনেট পরিসেবা এদিকে ছিল না। যদিও ভার্চুয়াল প্রোগ্রামের মাধ্যমে তিনি বিখ্যাত গ্লোবাল টেলিভিশন ও আন্তর্জাতিক এন,আর,বি নিউজ চ্যানেলে নিয়মিত অনুষ্ঠান করে এই শহিদের রক্তস্নাত বরাক উপত্যকাকে বর্হিবিশ্বে তোলে ধরেছেন। শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক এন,আর,বি,নিউজ ডটকম ২০২২ সালে কবির বহু বৈচিত্র্য সৃজনের জন্য তাকে "উনিশের সম্মাননা" জানিয়েছে।

কবি আশুতোষ দাসের জন্ম ১৯৫৫ ইংরেজির ১৩ডিসেম্বর। পিতা অনিলচন্দ্রদাস ও মাতা সুপ্রভা দেবী দুজনেই আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন। পারিবারিক পরিবেশে কবির সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। হাইলাকান্দি জেলার লালার চন্দ্রপুরে জন্ম এবং ওই গ্রামের তারাচাঁদ পাঠশালায় একটু বেশি বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে পরবর্তীতে হাইলাকান্দি শহরে চলে আসেন মা ও ভাইবোন নিয়ে। বাবা হাইলাকান্দি শহরের সরকারি গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে বাংলা শিক্ষক ছিলেন। চন্দ্রপুর গ্রামে তার দাদা সজল দাস স্কুল থেকে ফেরার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ধনুষ্টঙ্কারের আকস্মিক প্রকোপে মৃত্যুবরণ করেন। সেই ঘটনার পরই তার মা সুপ্রভা দেবী স্কুল বদলী করে হাইলাকান্দি শহরে চলে আসেন। শোকাহত মা প্রতিদিন কাজ শেষ হলে কিংবা অবসরে পুত্রশোকে কাঁদতেন। প্রতিনিয়ত এমন দৃশ্য দেখে তিনি খুব পীড়া অনুভব করতেন। বাবাও পুত্রশোক ভুলতে ছাত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। মা ছিলেন ধর্মপ্রাণ, তাই তাকে খুশি রাখতে আশুতোষ দাস নানা গ্রন্থ থেকে পাঁচালি জাতীয় কিছু লেখা পাঠ করে শোনাতেন। সেসব লেখা পড়তে পড়তে লেখার জগতে চলে আসেন কবি; এবং সেই কিশোর বয়স থেকেই কবিতা লেখা শুরু। বিষন্ন মাকে ধর্মীয় পাঁচালি শোনাতেন। কবির মা তার কণ্ঠে পাঁচালি শুনে শুনে ঘুমিয়ে পড়তেন। পুত্রশোকে কাতর মাকে কবিতা শুনিয়ে শুশ্রুষার কাজ করতেন তিনি। তাই আজও বিশ্বাস করেন কবি; শারীরিক অসুস্থতার জন্য বড়-ছোট সরকারি হাসপাতাল বা নার্সিং হোম রয়েছে কিন্তু মানসিক সুস্থতার জন্য কবিতা কিংবা অন্য কোন সৃজনকর্ম চর্চার বিকল্প নেই। অর্থাৎ সমাজকে শুভ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে কবিতার বোধ ভাবনার সঙ্গে সংপৃক্ত থাকতে হবে। ব্যক্তিজীবনে আশুতোষ দাস এক আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি থেমে থাকেননি। স্কুলে ভুলেও কোনদিন দেরিতে যাননি বা স্কুল কখনো ফাঁকি দেননি। স্কুলের পরিত্যক্ত এক কক্ষকে বৈঠকঘরের মতো সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে সেখানে বসেই পড়াশোনা ও লেখালেখি করতেন। সেই কক্ষে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ছড়া নাটিকা রিহার্সাল দিতেন। শিলচর দূরদর্শনের জন্য পরিবেশ নিয়ে ছড়া নাটিকা 'বাবা গেছেন জঙ্গলে" লিখে তিনি নির্দেশনাও দেন। বরাক উপত্যকার প্রথম আঞ্চলিক ভাষায় টেলিফিল্ম "আনুখকা স্বপ্নর কিচ্ছা"র দুটি পর্বের জন্য চিত্রনাট্য লিখেছেন তিনি। বরাক উপত্যকার প্রথম মনোরঞ্জনমূলক বাংলা সিনেমা 'পারদর্শিনী'র গল্প ও গীত রচনা করেন তিনি। প্রকাশ চান্দ সুরানা প্রয়োজিত সেই ফিল্মের পরিচালক ছিলেন হেমন্ত দত্ত পুরকায়স্থ। বরাক উপত্যকা থেকে প্রথম স্বচ্ছ ভারত নিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে দিল্লি দূরদর্শনে তার গল্প হিন্দিতে অনুবাদ হয়ে সম্প্রচারিত হয়েছে টেলিফিল্ম "সাতোয়াঁ আশমান" এ। সময়জ্ঞান ও শৃঙ্খলাবোধ মেনে চলেই দক্ষতার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা

যথাযথ ভাবে আজও করে যাচ্ছেন তিনি। পৃথিবীর বিভিন্ন মঞ্চ ও ইলেকট্রনিক-বৈদ্যুতিক সামাজিক মাধ্যমে কবির ত্রিশ এর অধিক বাচিক শিল্পীরা কবির কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তাদের মধ্যে কলকাতার আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাচিক শিল্পী গায়ত্রী বোস, বিখ্যাত কবি সাংবাদিক কলকাতার বরুণচক্রবর্তী, কলকাতার সঞ্চালক মধুমিতা বসু, বাংলাদেশের কবিতা কথনের কর্ণধার ইমরান সাহা, কলকাতার কৃতিকণা, গুয়াহাটির কবি বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, শিলচরের হরিপ্রিয়া পাল, আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড° বিশ্বতোষ চৌধুরী, শিলচরের সম্পাদক কবি মিতা দাস পুরকায়স্থ, বাচিক শিল্পী বিশ্বরূপা পুরকায়স্থ, কলকাতার বাচিক শিল্পী ও কবি শাহানারা খাতুন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শল্যচিকিৎসক শিলচর কল্যাণী হাসপাতালের কর্ণধার লক্ষ্মণ দাসও কবির কবিতা আবৃত্তি করেছেন। কবির ১৮টি বিভিন্ন ধরনের বই রয়েছে। ১২-এর অধিক টেলিফিল্ম ডকুড্রামা তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্য লিখেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানা গ্রন্থে তার গল্প কবিতা প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। কবি আশুতোষ দাসের লেখায় বিশেষ একটা দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যের অত্যাধুনিক আঙ্গিক নিয়ে যেমন তিনি সচেতন ঠিক তেমনি তিনি সৎসাহস নিয়ে ভেদভাব, জাতপাত আর বর্ণবৈষম্য ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লিখে যাচ্ছেন। তিনি শিলচর আকাশবাণী থেকে আশীর দশকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেতার নাট্যপাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় "ক্ষতচিহ্ন" জন্য পুরস্কৃত হন।শিলচর বেতারে তার লেখা "জারিনা" বেতার নাটকটি নিগ্রো-কালা-সাদার বর্ণবাদী বৈষম্যের বিরুদ্ধে সম্প্রচারিত হলে তখন বহু দেশে বেশ আলোচিত হয়। সঙ্গীত সুধাকর ভুপেন হাজারিকা তার লেখা ভ্রূণহত্যার বিরুদ্ধে "জঠর" শিলচর দূরদর্শন সম্প্রচারিত টেলিফিল্ম দেখে প্রশংসা করেন এবং মানবিক দলিল বলে আখ্যায়িত করেন। এই ডকুফিল্মের পরিচালক ছিলেন ভুপেন হাজারিকা ঘনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পরিচালক পুলকগগৈ। জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত পরিচালক রাজেন রাজখোয়ার অনুরোধে তিনি তাদের জন্য লিখেন "যখন ধানের গন্ধ'। এইদুই ফিল্মের চিত্রনাট্য লিখেছেন আশুতোষ দাস নিজেই। এ অঞ্চলের সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করে লিখিত "মুক্তির সন্ধানে" তথ্যচিত্রটি শিলচর দূরদর্শন থেকে সম্প্রচারিত হয়েছে। সেই তথ্যচিত্র "মুক্তির সন্ধানে" সর্বভারতীয় স্তরে আলোচিত হয়েছে এবং মাস কমিউনিকেশনের গবেষকরা আকর ভি, ডি, ক্লিপ তাদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বেতার, মঞ্চ, মুক্ত অঙ্গণ,

অনলাইন, অফলাইনে সব মাধ্যমেই কবি সক্রিয়। প্রসার ভারতীর আমন্ত্রণে পর পর দুবার তিনি শিলচর দূরদর্শনের পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিচারক মন্ডলীতে ছিলেন। সহিংসতা, জাতপাত ভেদভাব, সমস্ত রকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তার লেখনি সবসময় প্রশংসনীয় হয়ে আসছে। তাঁর দাঙ্গা বিরোধী মঞ্চ নাটক "একটি গুজবের রূপকথা" বইটি বহু পঠিত ও আলোচিত হয়েছে। ব্রাত্যমানুষের কথামুখ তিনি। দেশে বিদেশে বেসরকারি অনেক সম্মান পুরস্কার জুটলেও সরকারি কোন ভাতা তার ভাগ্যে জুটেনি। দিল্লির দলিত সাহিত্য আকাদেমি, আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলন, কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রক ও আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি! শুধু তাই নয় পঞ্চাশ বছর ধরে বেলাভূমি লিটিল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছেন। এখন পর্যন্ত ৮২ সংখ্যা বের হয়েছে। কবির কবিতা গল্পের মূল বিষয় ভালোবাসা ও বহুবর্ণের অনন্ত সৌন্দর্যের বিদ্যুৎ চ্ছটায় আলোকিত জীবনবোধ। কবি "দগ্ধ আকাশ", "এইসময়ে জটায়ু", কমলা সইরাণি আমলকী গাছ এবং মাম্পী ডিমাসা, একটি গুজবের রূপকথা এইসব নাটকের পাণ্ডুলিপির জন্য পরপর পাঁচবার বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। কবির উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো-"মালিনী বিলের আখ্যান" বরাক উপত্যকা জনবসতি গড়ার ওপর ঐতিহাসিক গবেষণাধর্মী উপন্যাস। -কমলার জিজ্ঞাসা (কাব্যনাট্য) জলে স্থলে ভালোবাসা (কাব্যগ্রন্থ) হৃদয় ফোটে পড়শির বকুল (কাব্যগ্রন্থ) ভালোবেসে বেঁধেদেই অনন্ত ঘুঙুর (কাব্য গ্রন্থ) চাঁদকে শিকল পারতে গেলে (কাব্য গ্রন্থ), মেঘে ওড়ে ভালোবাসার উত্তরীয়, (কাব্যগ্রন্থ) আজ আমাদের উৎসব, (কাব্যগ্রন্থ) শহিদের জামা আকাশে উড্ডীন (কাব্যগ্রন্থ) যখন ধানের গন্ধ, (গল্পগ্রন্থ) জেগে ওঠার গান, (গল্প গ্রন্থ) প্রতিবেশীর অলিন্দে, (অনুবাদ সংকলন) এই শিশুদের বাগানে, (ছড়ার বই) বরাক উপত্যকার মাতৃভাষা নিয়ে তার কবিতার বই "শহিদের জামা আকাশে উড্ডীন", "কচিপাতার কোলাহল" (ছড়ার বই) ইত্যাদি। কবি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত থাকলেও তাকে কবি বলেই খ্যাত রয়েছেন; কবির সৃজনকর্ম দেখে দিল্লি অরুণ কুমার বর্মণ তাকে প্রজ্ঞা মেইল আন্তর্জাতিক সম্মান তার বাড়িতে এসে দিয়ে যান। শনবিলের সূর্যোদয়, গ্রেহাম সাহেব ও সম্পা দিদিমনি, মৃদুল আসবে ইত্যাদি উপন্যাস, কাব্য উপন্যাস হৃদয় আকাশে মৃদঙ্গ মুরলী বাজে, কাব্যনাট্য ধলেশ্বরী ইত্যাদির রচয়িতা তিনি। কবির অসাধারণ কাব্যকৃতি এবং বাংলা কবিতায় ভালোবাসা ও ইতিবাচক ভাবনার জন্য তাকে বেসরকারি সুবৃহৎ অনুষ্ঠানের ম্যানিনা সংবাদ গোষ্ঠী তাকে ভারত ডিগনিটি এওয়ার্ড দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ম্যানিনা সম্পাদক বর্ণালী বিশ্বাস। অনুষ্ঠান হচ্ছে ১৫ নভেম্বর '২০২৫ কলকাতার পার্ক হোটেলে। কবির বয়স সত্তর অতিক্রান্ত। তবুও তিনি সৃজনশীল থেকে প্রতিদিন তার ইতিবাচক লেখার দ্বারা সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন।

<><><><><>

অনুসন্ধান

বরাকের বাংলা সাহিত্যের লিগ্যাসি

উত্তমকুমার সাহা

ROYAL STORE
College Masjid Road, Hailakandi
Proprietor: Ataur Rahman
Rice, Sugar, oil, flour, onions, garlic, and other daily essentials are sold at affordable prices.
Contact No - 9954504536

'বরাক ও সুরমা নদীর উপত্যকা তো মেঘনা উপত্যকারই (ময়মনসিং-ত্রিপুরা-ঢাকা) উত্তরাংশ মাত্র। এই দুই উপত্যকার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা কিছু নাই বলিলেই চলে এবং এই কারণেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পূর্ববাংলার এই কয়টি জেলার --বিশেষভাবে ত্রিপুরা ও ময়মনসিং জেলার --সংস্কার ও সংস্কৃতি এত সহজে শ্রীহট্ট-কাছাড়ে বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল।' নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব'-র (প্রথম দেজ সংস্করণ ১৪০০ বঙ্গাব্দ) ৬৯ নং পৃষ্ঠায় এভাবেই এই অঞ্চলের ভূগোল তুলে ধরেছেন। বরাক উপত্যকার সংস্কার-সংস্কৃতিরও একটা আভাস মেলে এই বাক্যবন্ধে।

সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এই অঞ্চলের স্বকীয় ছাপ লক্ষ্য করা যায় মনসামঙ্গলে। মনসামঙ্গল গোটা বঙ্গদেশ জুড়ে রয়েছে। কাছাড়েও তা প্রচলিত। তবে এখানকার মনসামঙ্গলে নৌকোপূজা রয়েছে, যা অন্যত্র নেই। এ ছাড়া, এই অঞ্চলের মনসামঙ্গলে স্থানীয় সংস্কৃতিই প্রাধান্য পেয়েছে। রামচন্দ্র চৌধুরীর পদ্মপুরাণে সূর্যব্রতের উল্লেখ রয়েছে,

'মাঘমাসের দিন রবিবার চাইয়া
সূর্যদেব পুজে লোকে জগত জুড়িয়া
ঐদিনে আমি গেলাম পূজা লইবারে
অপমান করে যত কী বলিব তোরে।'

আরেক জায়গায় রয়েছে সিঁদলের কথা,

'অগ্নি মধ্যে সিদলকে কিঞ্চিত জ্বালাইয়া।
কাঁচা মরিচ আদা লবন মিশাইয়া।।
মিশ্রিত করিয়া যদি করহ ভক্ষণ।
তবে সিঁদলের মর্ম জানিবা আপন।।'

বাংলাদেশে মনসা পুজোর প্রচলন পঞ্চদশ শতকে। আর চণ্ডীমঙ্গল ষোড়শ শতকের। গল্পের আকারে চণ্ডীমঙ্গল এখানেও রয়েছে। কার্তিকমাসে এর ব্রত শুরু হয়। প্রতিমাসে একটি করে ব্রত হয়। এর গল্পটি এ রকম, সওদাগর বাণিজ্যে যেতে চান না। ফলে বড় অভাব সংসারে। দাসী বেরোন আগুন জ্বালানোর সামগ্রী সংগ্রহে। দেখেন, সেদিন সব বাড়িতে রান্না বন্ধ। কী ব্যাপার! মহিলারা ব্রত করছেন। উদয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রত। দাসী গিয়ে সওদাগরের স্ত্রীকে বললেন। তাঁরাও ব্রত করতে শুরু করেন। এক-একটা করে ব্রত যায়, সওদাগরও বাণিজ্যে যেতে একটু একটু করে আগ্রহী হন। চৈত্রমাসে শেষ ব্রতের পর সওদাগর একদিন বাণিজ্যে রওয়ানা হলেন। এরপর সওদাগরের স্ত্রী ব্রত বন্ধ করে দেন। এদিকে, সওদাগর বাণিজ্যে গেলেন বটে, কিন্তু তিনি যে আর ফেরেন না! বাড়িতে আবার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত শুরু হয়। সওদাগরও ফিরতে শুরু করেন। শেষ ব্রতের দিনে সওদাগরের জাহাজ নদীতীরে নোঙর করল। স্বামী আসার খবরে সওদাগর-পত্নী ব্রতের প্রসাদ না খেয়ে ঘাটে চলে যান। তাতে জাহাজ আবার চলতে শুরু করে। সওদাগর নামতেই পারেননি। কী হল, কী হল! ততক্ষণে দাসী নিয়ম মেনে প্রসাদ খেয়ে ঘাটে আসেন। তাকে দেখেই জাহাজ তীরে এসে লাগে। সওদাগর নেমে দাসীর সঙ্গে তার বাড়ি চলে যান। সওদাগর-পত্নী পরের বছর এই দাসীর (বাধাই-দাসী নাম ছিল তার) মৃত্যু কামনায় ব্রত শুরু করেন। এ বারও ফল মেলে। দাসীর মৃত্যু হয়। আগের মতই মাঝপথে ব্রত বন্ধ হয়ে যায়। তখন দেখা যায়, সওদাগর দাসীর হাড়ের মালা গলায় পরে ঘুরে বেড়ান। আর 'হায় বাধাই, হায় বাধাই' করেন। সওদাগর পত্নী আবারও মঙ্গলচণ্ডীর শরণ নিলেন। শুরু হয় ব্রত। এর প্রভাবে সওদাগর গলা থেকে মালা নামাতে শুরু করেন। প্রথমে পেটে, পরে হাত, পা হয়ে একদিন মালা নদীতে বিসর্জিত হয়। এই যে হাড়ের মালার কথা বলা হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে চর্যাপদে।

এই অঞ্চলে বাংলাচর্চা কত প্রাচীন, আমরা এর উল্লেখ পাই সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড (প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯৯১)-তেও। ২০৭ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, 'কাজকর্মে বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম এবং ব্যাপক ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দী হইতে ত্রিপুরা-কাছাড়-কামতা অঞ্চলেই পাইতেছি।'

আয়নাপরীর মতো পালাগানও এর প্রমাণ দেয়। ষোড়শ শতক থেকে এই পালাগান চলছে। এই প্রসঙ্গে কাছাড়ের সুফিগানের কথা উল্লেখ করতে হয়। এখানকার সব সুফিগান বাংলাতেই গাওয়া হয়।

'পিরিতের ছেল বুকে যার কলঙ্ক তার অলঙ্কার
কুলমানের ভয় নাইরে তার।।
পিরিতের নয় নিশানি সদায় থাকে মন
উদাসী গো
সদায় থাকে প্রেমানলে নিরানন্দ নাহি তার।।'

নন্দলাল শর্মা সংকলিত ও সম্পাদিত মরমী কবি শিতালং শাহ (বাংলা

একাডেমী, ঢাকা ২০০৫) গ্রন্থের ১২০নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে এই পদ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কোনও বিভাজন ক্রিয়াশীল নয়, তার প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। শিতালং শাহের এই পদের সঙ্গে আমরা চণ্ডীদাসের একটি পদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। পদটি এইরকম----‘কলঙ্কা বলিয়া ডাকে সব লোকে/তাহাতে নাহিকো দুখ/বধূ তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার/গলায় পরিতে সুখ।’

আবার বরাক উপত্যকায় মধ্যযুগ থেকে সমৃদ্ধ নাথসাহিত্যের ধারা দেখতে পাওয়া যায়। রাজমোহন নাথ সম্পাদিত ‘বঙ্গীয় নাথ-পন্থের প্রাচীন পুঁথি’-তে (১৯৬৪ সালে প্রকাশিত) ‘অথ হাড়মালা গ্রন্থ (ক)’ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, হাড়মালা গ্রন্থটি পেয়েছিলেন হাইলাকান্দি কাপনারগ্রামের গৌড়মণি মহন্তের বাড়িতে। এই কাব্যে শিবের গলার হাড়মালা দেখে গৌরী এর মাহাত্ম্য জানতে চেয়েছিলেন। এই রচনার ৯৩ নং পৃষ্ঠায় শিব সেই মালার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেনঃ

‘এককালে হরগৌরী কৈলাশ শিখরে
গঙ্গা আদি চারি ভার্যা লৈয়া ক্রীড়া করে।
এই মত নানা রঙ্গ করে ভোলানাথে
হাড়মালা দেখে দেবী শিবের গলাতে।
বিস্মিত হইয়া দেবী বলেন শিবেরে
হাড়মালা কেন প্রভু কণ্ঠের উপরে।
বড়ই বিস্ময় প্রভু হৈল মোর মনে
ইহার স্বরূপ প্রভু কহিবা আপনে।’

বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত যুগপন্থার যে গুচ্ছ সাধন প্রণালীর ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছিল তাকে কেন্দ্র করেই এই বিশিষ্ট সাহিত্য শাখাটির সৃষ্টি হয়েছে। গবেষকদের সিদ্ধান্ত হল, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে গোরক্ষনাথের নেতৃত্বে নাথ যোগী ধর্ম ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচার লাভ করেছিল। পরবর্তী সময়ে সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি ও নেপালি ভাষায় নাথ-সাহিত্য রচিত হয়েছে।

আমরা হাড়মালার উল্লেখ পাই কাহ্নপাদের লেখা দশ নং চর্যাতেও,

‘তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেজিলি হাড়ের মালী।’

মণীন্দ্রমোহন বসুর ভাবানুবাদ,

‘তুমি ডোম্বি, আমি কাপালিক (তব তুল্য)
তব তরে লইয়াছি আমি হাড়মাল্য।’

আর এই অঞ্চলের লোকসাহিত্যের পুরোটাই তো বাংলায়। ফলে বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা যে বহু পুরনো, তা বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না। আমরা যদি ডিমাসা রাজসভার সাহিত্য দেখি, সেখানেও দেখা যায় বাংলাভাষার ব্যবহার। ডিমাসা রাজারা বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিকাশে কাজ করে গিয়েছেন। ‘শ্রীনারদী রসামৃত’ এর বড় উদাহরণ। হৈড়ম্ব রাজা সুরদর্পনারায়ণের (১৭০৮-১৭২০) সভাকবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি ভট্টাচার্য অনুদিত গ্রন্থটি ২০০৭ সালে সম্পাদনা করতে গিয়ে অমলেন্দু ভট্টাচার্য ‘ঋণস্বীকার’ অংশে লিখেছেন, ‘প্রায় তিনশো বছর আগের এই সাহিত্য নিদর্শনটি বিদ্যাচর্চায় অশেষ উপকার করবে সন্দেহ নেই।’

এখানকার বঙ্গভাষীদের লিগ্যাসি যে কত পুরনো, এইসব নানা উদ্ধৃতি ও পদে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। সঠিক বংশবৃক্ষ তৈরি করতে গেলে কোন পূর্বপ্রজন্মে গিয়ে যে ঠেকবে! সে দায়িত্ব না-হয় গবেষকদের জন্যই ছাড়া গেল। আর যারা এখানকার বঙ্গভাষীর লিগ্যাসি নিয়ে সন্দেহে রয়েছেন, তাদেরও একবার বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চার এই দিকটি খতিয়ে দেখার বিনম্র অনুরোধ রইল।

<><><><><>

শুভ শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর হাইলাকান্দিবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন।

জুহি আক্তার চৌধুরী
উপ-সভাপতি
হাইলাকান্দি জেলা পরিষদ

আফজল হোসেন চৌধুরী
আইনজীবী
প্রতিনিধি - উপ-সভাপতি
হাইলাকান্দি জেলা পরিষদ।

সত্যমেব জয়তে

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায়
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জল জীবন মিশন

হাইলাকান্দি

ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ জল

- গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল।
- প্রতিদিন প্রতিটি ঘরে জনপ্রতি।
- নূন্যতম ৫৫ লিটার।
- বিশুদ্ধ পানীয় জল।

এটি আপনার প্রকল্প, এই প্রকল্পকে কার্য্যক্রম করে রাখা আপনার কর্তব্য

অমিতাভ চৌধুরী
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার,
পি.এইচ, ই, হাইলাকান্দি

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
কামনা করি পুজোর দিনগুলো নির্বিঘ্ন ও আনন্দমুখর হয়ে উঠুক -

লালা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, লালা

অভিজিৎ বে
এগজিকিউটিভ অফিসার

তুরসি রায়
চেয়ারপার্সন

মাতৃ আরাধনার এই শুভলগ্নে আসুন আমরা সবাই মিলে মা এবং শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। মনে রাখতে হবে আজকের শিশু আগামী দিনের সুনাগরিক।

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন -

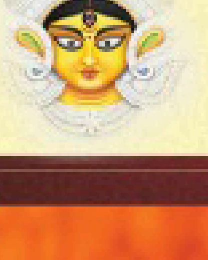

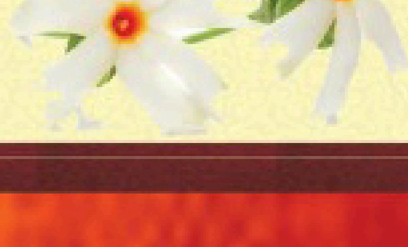

মিলন দাস
সভাপতি, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা,
হাইলাকান্দি জেলা কমিটি

Hailakandi (Bengali News Magazine), Vol.-30, No.-6, RNI Regd. No. 64351/96 INR-₹50

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে
জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আনন্দমুখর শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে
সকলের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি-

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

ড° হিমন্তবিশ্ব শর্মা
মুখ্যমন্ত্রী, অসম

গৌতম গুপ্ত
সভাপতি, ড্রিমস,
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, হাইলাকান্দি

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায়
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন –

PRAKASH ENTERPRISES
GROUND FLOOR, HOTEL SHYAMA INN, JANIGANJ BAZAR,
SILCHAR, DIST- CACHAR, ASSAM-788001
MOBILE : 7002504799, 7002802208

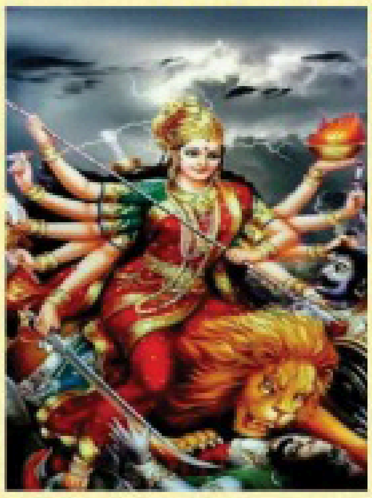

AUTHORISED DISTRIBUTOR
Livguard
RISHABH FAN
KENT Smart Chef Appliances

LIVGUARD -----EVEREADY -----KENT-----RISHABH FAN

Edited, Printed & Published by Jarin Aktar Mazumder on behalf of N. M. Creations, Lala
Dist.-Hailakandi, Assam, E-mail : nmazumderhkd@gmail.com, Phone : 8638898750